Contents

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৪৮
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

العلْمانية

تأليف : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
ছফর ১৪৩৫ হি./পৌষ ১৪২০ বাং/ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি.
২য় সংস্করণ
যিলক্বা'দ ১৪৩৭ হি./শ্রাবণ ১৪২৩ বাং/আগষ্ট ২০১৬ খ্রি.

॥ **সর্বস্বত্ব প্রকাশকের** ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Dharma Niropekkhotabad (Secularism) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**, Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

মানুষের মধ্যে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বাধ্যতা ও অবাধ্যতা দু'টি প্রবণতা রয়েছে। শয়তান দ্বিতীয় প্রবণতাকে উস্কে দিয়ে তাকে তার প্রতিপালকের আনুগত্য হ'তে বের করে নেয়। তখন তার মধ্যে মুক্তকচ্ছ ব্যক্তির মত সাময়িকভাবে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার সুখানুভূতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে হতাশার কৃষ্ণগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। অতঃপর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে লক্ষ্যহীন জীবনতরী নিয়ে যত্রতত্র ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তার বাউণ্ডুলে জীবনের অবসান ঘটে। প্রাপ্তির ঝুলিতে অপ্রাপ্তির বেদনা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুতঃ শয়তানের উদ্দেশ্য হ'ল সেটাই।

পক্ষান্তরে আরেক দল মানুষ তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী স্বীয় পালনকর্তার বিধান মেনে জীবন যাপন করে এবং আখেরাতে সর্বোত্তম পারিতোষিক লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এরা শয়তানের প্রতারণা বুঝতে পারে এবং নিজেকে তার খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে নিতে সক্ষম হয় আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে।

উক্ত দু'দল মানুষের দু'টি করে বৈশিষ্ট্য ও দু'রকম পরিণতি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তার কৃতকর্মসমূহ স্মরণ করবে' (৩৫) 'এবং দর্শকের জন্য জাহান্নামকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে' (৩৬)। 'তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে' (৩৭) 'এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে' (৩৮) 'জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে' (৩৯)। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামী হ'তে বিরত রেখেছে, (৪০) 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৩৫-৪১)*।

আমাদের আদি পিতা আদম ছিলেন মানব জাতির প্রথম নবী। তিনি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন ও সন্তানদের সেভাবে পরিচালিত

করেছেন। এতদসত্ত্বেও ধর্মের বিধান লংঘন করে পুত্র ক্বাবীল তার ছোট ভাই হাবীলকে হত্যা করে ভাল-র প্রতি হিংসা বশতঃ। এভাবেই ধর্মহীনতা ও ধর্মপরায়ণতার সংঘাত মানব সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে।

আধুনিক যুগের সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উক্ত ধর্মহীনতার মন্দ প্রবণতা হ'তে উৎসারিত। যেখানে ধর্মের কোন নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতা নেই। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর খ্রিষ্টবাদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের গোড়াপত্তন ঘটে। যেখানে ধর্মের চাইতে বস্তুকে মুখ্য হিসাবে তুলে ধরা হয়। ঊনবিংশ শতকে এসে যা একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। বৃটিশ সেক্যুলারিস্ট জ্যাকব হলিওক ১৮৫১ সালে প্রথম 'সেক্যুলারিজম' নামকরণ করেন।

বস্তুতঃ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' হ'ল মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত। পক্ষান্তরে ইসলাম হ'ল আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'। যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী দ্বীন বা সরল পথের নাম। যা সত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। জীবন তরঙ্গে যা মানুষকে সর্বদা সঠিক ও নিশ্চিত ঠিকানার সন্ধান দেয়। ফলে বিশ্বাসী মানুষের জন্য এপথে কোন অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেই। এ পথে চললে সে সফলকাম। না চললে সে ব্যর্থকাম। দু'টির মাঝে তৃতীয় কোন পথ নেই। যদি কেউ সে পথ তালাশ করে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। থিসিস, এন্টি থিসিস আর সিনথেসিসের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে সে জীবনপাত করবে। কিন্তু প্রকৃত সত্যের সন্ধান সে পাবে না আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত। অথচ ইসলামের পথ স্বচ্ছ ও আলোকময়। যে কেউ এপথ থেকে বিচ্যুত হবে, সে ধ্বংস হবে। মানবজাতির বিগত ও বর্তমান ইতিহাস তার জাজ্বল্যমান নযীর।

আলোচ্য বইয়ে আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে'র অশুভ পরিণতি এবং ইসলামের সাথে এর বৈপরীত্য তুলে ধরেছি। যাতে সত্যিকারের কোন সত্যসন্ধানী ব্যক্তি এর ধোঁকায় না পড়ে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অনুসারী হয়ে তার সার্বিক জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ হেদায়াতের মালিক। আমরা কেবল তাঁরই করুণার ভিখারী। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা এবং তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের প্রতি সকল দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী
২৭ শে আগষ্ট ২০১৬, শনিবার।

বিনীত-
লেখক।

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

(العِلْمانية)

‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ ঐ মতাদর্শকে বলা হয়, যা কোন ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ যে মতাদর্শের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’-কে ইংরেজীতে ‘সেক্যুলারিজম’ (Secularism) ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় ‘সেক্যুলারাইট’ (Secularite) বলা হয়। কিন্তু আরবীতে ‘ইলমা-নিয়াহ’ (العِلْمانية) বলা হয় নিয়ম বিরুদ্ধভাবে। কেননা এই শব্দটির সাথে ‘ইল্‌ম’ (العلم)-এর কোন সম্পর্ক নেই। আরবী ‘ইল্‌ম’ শব্দটি ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় Science বা ‘বিজ্ঞান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপরে তার সাথে ان যোগ করা হয়েছে মূল অর্থকে যোরদার করার জন্য। যেমন রূহানীয়াহ, রব্বানীয়াহ, জিসমানীয়াহ, নূরানীয়াহ ইত্যাদি। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Any movement in society directed away from otherworldliness to life on earth... ‘এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করায়’...।[১] অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, The belief that religion should not be involved in the organization of society, education etc. ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ এমন একটি বিশ্বাস যে,

---

১. The New Encyclopaedia Britanica. 15th Edn. 2002. Vol-X. P. 594. সেখানে আরো বলা হয়েছে, The movement towad secularism has been in progress during the entire course of modern history and has often been viewed as being anti-Christian and anti religious.

ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রভৃতি বিষয়ে যুক্ত হওয়া উচিত নয়'।[২]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রূহ হ'ল 'দুনিয়া'। এখানে ধর্মীয় কোন কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। ইসলামী দুনিয়ায় প্রথম যার রাষ্ট্রীয় প্রতিফলন ঘটে তুরস্কে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামী খেলাফত' উৎখাত করে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে ধর্মকে পৃথক করাই হ'ল (فَصْلُ الدِّيْنِ عَنِ الدَّوْلَةِ) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য যদি এর দ্বারা জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করা বুঝানো হয়, তবে সেটাই যথার্থ হবে।

তাই বলা চলে যে, ধর্মহীনতার উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কথা (هِىَ إِقَامَةُ الْحَيَاةِ عَلَى غَيْرِ الدِّيْنِ)। উদার গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সহ্য করা হয়। সেজন্য সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি ধর্মহীন বা Non-Religious। পক্ষান্তরে নাস্তিক ও কম্যুনিষ্ট দেশসমূহে এই মতবাদটি ধর্মবিরোধী বা Anti-Religious। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের উভয় ক্ষেত্রে এই মতবাদটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা মুসলিম জীবনের ভিত্তিই হ'ল ইসলাম ধর্মের উপর। 'ইসলাম' পরিপূর্ণ একটি 'দ্বীন' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। ফলে মুমিন জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগ ইসলামের আওতা বহির্ভূত নয়। সেকারণ দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) বলেন,

جب جدا ہو دین سیاست سے + تو رہ جاتی ہے چنگیزی

'যখন রাজনীতি হ'তে দ্বীন পৃথক হবে, তখন সেখানে থাকবে কেবল চেঙ্গীযী বর্বরতা'।

বস্তুতঃ কুরআন নাযিলের পর বিগত সকল এলাহী দ্বীনের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। বিশ্বমানবতার জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন হ'ল

---

২. A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 2002), P. 1155.

‘ইসলাম’। এ দ্বীন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ‘অহি’-র উপরে ভিত্তিশীল। যেখানে কোনরূপ বাতিলের প্রবেশাধিকার নেই *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে দ্বীন রেখে গিয়েছেন, তা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন (بَيْضَاءَ نَقِيَّةً)। যদি বনু ইস্রাঈলের নবী মূসা (আঃ) আজ জীবিত থাকতেন, তাহ’লে এই দ্বীনের অনুসরণ ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকত না’।[৩] এ যুগে যদি কেউ দ্বীনে মুহাম্মাদী পরিত্যাগ করে, তবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে’।[৪] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ–

‘যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক, যে ব্যক্তি আমার আগমনবার্তা শুনেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ ইসলাম), তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে’।[৫] অথচ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হ’ল, মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বস্তুবাদী দর্শনের নাম, যেখানে অহি-র বিধানের কোন প্রবেশাধিকার নেই। যার একমাত্র লক্ষ্য হ’ল যেনতেন প্রকারেণ ‘দুনিয়া’ হাছিল করা।

বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের আড়ালে ধর্মনিরপেক্ষতাকে লালন করা হচ্ছে এবং বৈষয়িক জীবন থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ‘ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার’। ‘ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা’। ‘ধর্মে কোন রাজনীতি নেই। রাজনীতিতে কোন ধর্ম নেই’। এইসব বক্তব্য অন্যান্য ধর্মের বেলায় খাটলেও ইসলামের সাথে খাটেনা। কেননা অন্যান্য ধর্ম মানুষের তৈরী। পক্ষান্তরে ইসলাম হ’ল আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। যার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি সহ মানব কল্যাণে যা কিছু প্রয়োজন, সবই রয়েছে। যেখানে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের স্ব স্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। মূলতঃ

---

৩. আহমাদ হা/১৫১৯৫; বায়হাক্বী শু‘আব হা/১৭৬; আলবানী, মিশকাত হা/১৭৭, সনদ হাসান।

৪. দারেমী হা/৪৩৫, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৯৪।

৫. মুসলিম হা/১৫৩ ‘ঈমান’ অধ্যায়, ৭০ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০।

এসব বক্তব্যের উদ্দেশ্য হ'ল আদম সন্তানকে ইসলামের কল্যাণ সমূহ থেকে বঞ্চিত করা এবং মানুষকে আল্লাহ্র গোলামী থেকে ফিরিয়ে নিজেদের গোলামীতে আবদ্ধ করা।

উৎপত্তি (نشأة العلمانية) :

'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদটি মূলতঃ মানুষের জন্মগত কুপ্রবণতাকে উস্কে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর থেকে আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের গোড়াপত্তন ঘটে। যেখানে ধর্মের চাইতে বস্তুকে মুখ্য হিসাবে তুলে ধরা হয়। অতঃপর বস্তুবাদ বিভিন্ন বেশে ও বিভিন্ন নামে লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করে। পরে ঊনবিংশ শতকে এসে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' একটি আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

আঠারো শতকের দিকে ইংল্যাণ্ডের হব্স (১৫৮৮-১৬৭৯ খৃ.), লক (১৬৩২-১৭০৪ খৃ.) এবং ফ্রান্সের মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫ খৃ.), ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খৃ.), রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খৃ.) প্রমুখ চিন্তাবিদগণ ধর্মের বিরুদ্ধবাদী চেতনায় বারি সিঞ্চন করেন।[৬] তার কিছু পরে ডারউইনবাদ

৬. **(ক)** থমাস হব্স (Thomas Hobbes) ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিক ছিলেন। ১৬৫১ সালে প্রকাশিত Leviathan বইয়ের মধ্যে তিনি তাঁর Social contract theory বা 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' প্রকাশ করেন। যা পরবর্তীতে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। **(খ)** জন লক (John Locke) ইংল্যাণ্ডের অন্যতম রাজনৈতিক দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ ছিলেন। Father of Liberalism বা উদারতাবাদের জনক হিসাবে পরিচিত এই দার্শনিকের চিন্তাধারা বৃটিশ রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। **(গ)** মন্টেস্কু (Montesquieu) একজন ফ্রেঞ্চ আইনজীবী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক দার্শনিক ছিলেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মতবাদের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে অনুসৃত হয়। **(ঘ)** ভল্টেয়ার (Voltaire)। ফ্রান্সের এই ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ক্যাথলিক চার্চের একচ্ছত্র ক্ষমতা খর্ব করা এবং রাষ্ট্র ও চার্চের বিভক্তি করণ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। **(ঙ)** রুশো (Jean-Jacques Rousseau) একজন ফ্রেঞ্চ দার্শনিক ও লেখক ছিলেন। এমিলি (Emile) নাটকের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ও শিক্ষা দর্শন ফরাসী শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত The Origin of Species বা 'প্রজাতির উৎস' বইটিতে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খৃ.) যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, এ বিশ্ব-প্রকৃতি ও মাখলূক্বাত সবই বিবর্তনের মাধ্যমে আপনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।[৭] এর কোন বিচক্ষণ সৃষ্টিকর্তা বা পালনকর্তা নেই। পরকাল বলে কিছু নেই। প্রাণীর জন্ম, যৌবন ও লয় সবকিছুই তার স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল। যদিও ডারউইনের এই বিবর্তনবাদ বা Theory of Evolution তার জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানীগণ কেউই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। এমনকি এই মতবাদের বড় প্রবক্তা হাক্সলে (১৮২৫-১৮৯৫ খৃ.) পর্যন্ত এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেননি।[৮] কিন্তু স্রেফ আল্লাহদ্রোহী প্রবণতার সপক্ষে হওয়ার কারণে এ মতবাদকে গ্রহণ করা হ'ল। যা বস্তুবাদকে আরো প্ররোচিত করে। বরং বলা চলে যে, এই দুনিয়াসর্বস্ব দর্শন থেকেই পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও সভ্যতা জন্ম লাভ করে। নামকা ওয়াস্তে ধর্মে খ্রিষ্টান হ'লেও তাদের বাস্তব ক্রিয়া-কর্ম নিরেট Materialism বা বস্তুবাদী দর্শনের উপরে ভিত্তি করেই চলছে। একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হ'লেও বিশ্বব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় তাঁর কোন কর্তৃত্ব আছে বলে তারা স্বীকার করে না।

বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতে যেসব বস্তু পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আয়ত্তাধীন, কেবল তাই-ই সত্য। হিউম (১৭১১-১৭৭৬ খৃ.) তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও সংশয়বাদ (Scepticism)-এর সাহায্যে এই চিন্তা পদ্ধতিকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন।[৯] এমনকি যুক্তিসিদ্ধ বিষয়টির সত্যতার জন্যেও তিনি অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেন। যা

---

৭. চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ও ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন। Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৮. হাক্সলে ছিলেন। (Thomas Henry Huxley) ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত এই জীববিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদের অন্ধ প্রচারক হওয়ার কারণে Darwin's Bulldog হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৯. হিউম (David Hume) স্কটল্যাণ্ডের এই খ্যাতিমান দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও প্রবন্ধকার স্বীয় Empiricism বা অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

নাস্তিক্যবাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। দার্শনিক কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খৃ.) একটা মধ্যম পন্থা পেশ করে বলেন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আত্মার স্থায়িত্ব ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়গুলি আমাদের বোধগম্য নয়।[১০] তবে আমাদের বাস্তব বিচারবোধ বা Practical wisdom এগুলোর প্রতি বিশ্বাসের দাবী জানায়। অতএব শুধু নৈতিকতার হেফাযতের জন্য আল্লাহকে মান্য করা, তাঁকে ভয় করা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা যেতে পারে। এই মতবাদে আল্লাহকে একজন ক্ষমতাহীন 'নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট' বা Constitutional Monarch-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে মাত্র। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে আছে মূলতঃ হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, কান্টের ক্ষমতাহীন স্রষ্টাতত্ত্ব এবং ডারউইনের নাস্তিক্যবাদের চোরাবালির উপরে। যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত ও পশুত্ব সমুন্নত। যা কখনোই মানুষের কাম্য নয় এবং যার ধ্বংস অনিবার্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী শিল্প বিপ্লব বস্তুবাদকে অধিকতর শক্তিশালী করে। ঊনবিংশ শতকে এসে বস্তুবাদ একটি আন্দোলনে রূপ নেয়, যা দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হয়। ১ম ধারাটি ছিল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্র হ'তে ধর্মকে বিতাড়িত করা। এই ধারার নেতৃত্ব ছিল দ্বিমুখী : (ক) ধর্মতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন জন ওয়াটসন (১৮৪৭-১৯৩৯), ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২) প্রমুখ এবং (খ) রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বে ছিলেন কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), এঙ্গেল্‌স (১৮২০-১৮৯৫) ও তাদের অনুসারীগণ।[১১]

---

১০. কান্ট (Immanuel Kant) জার্মানীর এই দার্শনিক Central figure of modern philosophy বা আধুনিক দর্শনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত হ'তেন।

১১. **(ক)** জন ওয়াটসন (John Watson) স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগোতে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মতত্ত্ব ও রাজনৈতিক দার্শনিক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটির যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সেখানেই ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। **(খ)** ফয়েরবাখ (Ludwig Feuerbach) একজন জার্মান দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি তাঁর The Essence of Christianity (খ্রিষ্টবাদের সারকথা) নামক বইয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। যার মধ্যে তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। যা নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের পক্ষে কার্ল মার্কস, এঙ্গেল্‌স প্রমুখ পরবর্তী চিন্তাবিদদের উপর দারুণ

Contents

২য় ধারাটি ছিল এই যে, ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ Frontal attack বা সম্মুখ হামলা না চালিয়ে কেবল ক্ষমতার আসন থেকে বিতাড়িত করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা জীবনের বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ থেকে জনগণ যখন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হবে, তখন গৃহের ক্ষুদ্র পরিসর হতে ধর্ম আস্তে আস্তে বিদায় নেবে। কিন্তু যদি তাকে সম্মুখ হামলা করা হয়, তাহলে ধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠতে পারে। আর তা হবে এক মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের এই সুচতুর ও ধূর্ত পদ্ধতিটির নাম হ'ল 'সেক্যুলারিজম' বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

উৎপত্তির প্রত্যক্ষ কারণ (السبب المباشر فى نشأة العلمانية) :

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' উৎপত্তির প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য হয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্মের নামে সীমাহীন বাড়াবাড়ি। তারা তাদের সমস্ত অপতৎপরতা ও লাম্পট্যকে ধর্মের লেবাসেই সিদ্ধ করে নিয়েছিল। ফলে জনগণ তাদের ধর্মযাজকদের উপরে ক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথে খ্রিষ্টান ধর্মসহ সকল ধর্মের উপরে খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে ধর্মকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের সকল অঙ্গন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ

প্রভাব বিস্তার করে। **(গ)** কার্ল মার্কস (Karl Marx) একজন জার্মান দার্শনিক, সমাজবিদ ও রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি লণ্ডনে এসে গভীর গবেষণায় রত হন। অতঃপর সাথী এঙ্গেল্‌স-এর সহায়তায় ১৮৪৮ সালে The Communist Manifesto (কমিউনিস্ট ইশতেহার) বের করেন। যা জ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া জাগায়। তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ সমূহ একত্রে Marxism বা মার্কসবাদ নামে পরিচিত। যেখানে তিনি ধনী ও গরীবের মধ্যকার Class struggle বা শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যেই অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণা প্রদান করেন। যা পরবর্তীতে বহু রক্তের বিনিময়ে রাশিয়া ও চীনে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। **(ঘ)** এঙ্গেল্‌স (Friedrich Engels) ছিলেন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক, সমাজবিদ, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী। তিনি কার্ল মার্কসের সাথে মিলিতভাবে ১৮৪৫ সালে Marxist theory রচনা করেন। অতঃপর ১৮৪৮ সালে উভয়ে মিলে The Communist Manifesto প্রকাশ করেন। তিনি মার্কসের অর্থনৈতিক গবেষণা ও Das Kapital বই রচনা কালে তাঁকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অন্যান্য রচনা সমূহ প্রকাশ করেন।

রাখার মাধ্যমে একটি আপোষ রফা করা হয়। আর এটাই হল আধুনিক যুগের কথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'। খ্রিষ্টান জগতের ধর্মীয় নেতা জন পোপ পল বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হলেও বাস্তব জীবনে তার নিকট থেকে মানুষের কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই। তাই চরম ধূর্তামী ও প্রকাশ্য লাম্পট্য সত্ত্বেও খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলি দুষ্টু নেতাদেরকেই জাতির কর্ণধার হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ধর্মহীন গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। এই সিস্টেমে অধার্মিক লোকদেরই জয়জয়কার। ভাগ্যক্রমে কোন সৎ ও ধার্মিক লোক সেখানে ঢুকে পড়লেও তাকে হয় সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। নতুবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপোষ করে চলতে হয়। কেননা বাস্তব জীবনে আইনগতভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুযোগ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে নেই। ফলে এই মতবাদ পুরোপুরি একটি কুফরী মতবাদ এবং ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

১৮৩২ সালে আন্দোলনটি যোরদার রূপ ধারণ করে। জ্যাকব হলিওক (১৮১৭-১৯০৬), চার্লস সাউথওয়েল (১৮১৪-১৮৬০), থমাস কুপার (১৮০৫-১৮৯২), থমাস পিয়ারসন (১৭৮২-১৮৪৭) প্রমুখ ছিলেন তখনকার সময়ে এই আন্দোলনের পুরোধা।[১২]

১২.**(ক)** জ্যাকব হলিওক (George Jacob Holyoake) ছিলেন খ্যাতনামা বৃটিশ সেক্যুলারিস্ট। তিনি সেক্যুলারিস্ট পত্রিকা The Reasoner (১৮৪৬-১৮৬১) এবং সমবায় পত্রিকা The Co-operative-এর সম্পাদক ছিলেন (১৮৬৪-১৮৬৭)। তিনিই প্রথম ১৮৫১ সালে Secularism (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) এবং ১৮৭৮ সালে Jingoism (উগ্র দেশপ্রেম) নাম দু'টি উদ্ভাবন করেন। **(খ)** চার্লস সাউথওয়েল (Charles Southwell) লণ্ডনের একজন আমূল সংস্কারবাদী সাংবাদিক ও মুক্ত চিন্তাবিদ ছিলেন। **(গ)** থমাস কুপার (Thomas Cooper) ইংল্যাণ্ডের লেইস্টার-এর অধিবাসী একজন আমূল সংস্কারবাদী চিন্তাবিদ ও কবি ছিলেন। তিনি ১৯ শতকের গোড়ার দিকে সমাজ ও শিল্প সংস্কারের দাবীতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন তথা Chartist আন্দোলন-এর নেতা ছিলেন এবং ১৮৪২ সালে দু'বছর কারা নির্যাতন ভোগ করেন। সেখানে বসে তিনি Purgatory of Suicides (আত্মহত্যা সমূহের শুদ্ধিস্থল) নামে একটি রাজনৈতিক মহাকাব্য রচনা করেন। **(ঘ)** থমাস পিয়ারসন (Thomas Pearson) বৃটিশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধ সমূহে এবং ১৮১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্র একই ধর্মবিরোধী বস্তুবাদী চেতনা হতে উদ্ভূত। উভয়েরই শেষ লক্ষ্য ধর্মকে মানুষের জীবন থেকে নির্বাসন দেওয়া। বাংলাদেশে উভয় মতবাদের পিছনে পরাশক্তি সমূহের নিয়মিত মদদ রয়েছে। কখনো তারা আপোষে লড়ছে বটে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও তারা একমত হয়ে কাজ করছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যুক্তিসমূহ ও তার জবাব

(أجوبة الحجج فى حماية العلمانية)

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীগণ তাদের মতবাদের সপক্ষে কুরআন-হাদীছকে ব্যবহার করতেও কসুর করেননি। নিম্নে তাদের দলীল সমূহ ও তার জবাব প্রদত্ত হ'ল।-

(১) لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- (البقرة ٢٥٦)-

অনুবাদ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ যবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করবে ও আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধারণ করবে এমন এক সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

'ত্বাগূত'-এর আভিধানিক অর্থ শয়তান, জাদুকর, মূর্তি-প্রতিকৃতি, ভ্রষ্টতার উৎস ইত্যাদি। যা 'তুগইয়ান' ধাতু হতে উৎপন্ন। যার অর্থ 'সীমালংঘন'। পারিভাষিক অর্থ : اَلطَّاغُوْتُ أَن يَّتَحَاكَمَ الرَّجُلُ إِلَي مَا سِوَي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْبَاطِلِ 'কিতাব ও সুন্নাতের বিধান পরিত্যাগ করে অন্য যেসব বাতিলের নিকটে ফায়ছালা কামনা করা হয়, তাকে 'ত্বাগূত' বলা হয়'।[১৩]

---

১৩. ইবনু কাছীর, সূরা নিসা ৬০ আয়াতের তাফসীর (মর্মার্থ)।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাউকে ইসলামে প্রবেশ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করো না। কেননা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ সমূহ স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। কাউকে সেখানে জোর করে প্রবেশ করানোর দরকার নেই। বরং আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন ও দূরদৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন করবেন, সে দলীল-প্রমাণ দেখেই এতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ অন্ধ করে দিয়েছেন ও চোখ-কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, ঐ ব্যক্তিকে জোর করে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে কোন লাভ নেই।[১৪]

জবাব : উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে কোন দলীল নেই, বরং এর বিরুদ্ধে দলীল রয়েছে। কেননা এখানে হেদায়াত ও গোমরাহী পরস্পর থেকে স্পষ্ট ও পৃথক হয়ে গেছে বলা হয়েছে। ফলে মুমিন জীবনের কিছু অংশে হেদায়াত ও কিছু অংশে গোমরাহীর অনুসরণের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে আপোষ করতে কোন মুসলমানকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে অমুসলিমকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, আজকের সময়ে কথিত বহু জ্ঞানী-গুণী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অজ্ঞতাবশে অত্র আয়াতকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে বড় দলীল হিসাবে পেশ করছেন।

শানে নুযূল :

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আয়াতটি মদীনার আনছারদের কারণে নাযিল হয়। যদিও এর হুকুম সর্বযুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জনৈকা আনছার মহিলা যার কোন সন্তান বাঁচতো না, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি এবার তার কোন পুত্র সন্তান হয় ও বেঁচে থাকে, তাহ'লে তিনি তাকে ইহূদী বানাবেন। অতঃপর (৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে) যখন মদীনা থেকে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রের উচ্ছেদের হুকুম হ'ল, তখন আনছারগণ বলে উঠলেন যে, আমরা আমাদের সন্তানদের ছাড়তে পারি না, যারা দুগ্ধপানের জন্য ইহূদী

---

১৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত।

দুধমাতাদের কাছে রয়েছে। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১৫] যাতে বলা হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব আনছার সন্তানরা দুগ্ধপানের কারণে ইহূদী দুধমাতাদের কাছে থাকলেও আল্লাহ চাইলে তারা ‘হক’ বুঝে সময়মত ইসলামে ফিরে আসবে’।

(২) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ‘আমরা যিকর নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযত করব’ *(হিজর ১৫/৯)*। অতএব আল্লাহ যখন স্বীয় যিকর বা কুরআনকে হেফাযতের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন, তখন আমাদের সেখানে আর কিছু করার নেই। দ্বীনের হেফাযত আল্লাহ করবেন। দুনিয়ার হেফাযত আমরা করব।

জবাব : মুমিনের দ্বীন ও দুনিয়া দু’টিরই হেফাযতকারী আল্লাহ। তবে তিনি স্বীয় অহি-র হেফাযত করার বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর সেকারণেই অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থ বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআন আজও অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। স্বার্থান্ধরা হাদীছের মধ্যে ভেজাল ঢুকাতে চেষ্টা করলেও আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে ‘আহলুল হাদীছ’ বিদ্বানগণের সতর্ক প্রহরায় তা ছাটাই-বাছাই হয়ে ছহীহ-শুদ্ধগুলি অক্ষতভাবে উম্মতের সামনে এসে গেছে। যারা মুসলিম, তারা অহি-র বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এখন প্রয়োজন কেবল সেটাকে যথাযথভাবে নিজেদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনে বাস্তবায়ন করা।

(৩) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন’ *(কাফিরূন ১০৯/৬)*। অতএব ‘যার দ্বীন তার কাছে, রাষ্ট্রের কি বলার আছে’? কেননা ‘দ্বীন আল্লাহ্র জন্য এবং দেশ সবার জন্য’ (الدِّيْنُ لِلّٰهِ وَالْوَطَنُ لِلْجَمِيْعِ)।

১৫. ইবনু জারীর হা/৫৮১২; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; আবুদাঊদ হা/২৬৮২, হাদীছ ছহীহ; নাসাঈ কুবরা হা/১১০৪৮।

জবাব : উক্ত আয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মের সাথে কোনরূপ আপোষ না করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস করলেও অমুসলমানেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই তাদের কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেখানে তারা ইসলামের ফৌজদারী আইন ও হালাল-হারামের বিধানগুলি মেনে চলবেন। যার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজুদদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা, খুনের বদলা খুন, ব্যভিচারের কঠোর দণ্ড ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র যেমন সবার জন্য, আল্লাহ্র দ্বীনও তেমনি সবার জন্য। যেমন আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস সবার জন্য সমান।

মূলতঃ এই সূরাটি তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্যকারী সূরা হিসাবে পরিচিত। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার মত একটি কুফরী মতবাদের পক্ষে এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা হাস্যকর বৈ-কি!

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْيِىْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

‘নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনী বিষয়ে নির্দেশ দিব, তখন তোমরা সেটা গ্রহণ করবে। কিন্তু যখন আমি আমার ‘রায়’ অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেব, তখন নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ মাত্র’।[১৬] অত্র হাদীছ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব দ্বীনী জীবনে ইসলামী আইন মেনে চলব। কিন্তু দুনিয়াবী জীবনে আমরা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুসরণ করব।

১৬. মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

জবাব : উক্ত হাদীছে দ্বীন ও দুনিয়াকে পৃথক করা হয়নি। বরং দ্বীন ও রায়কে পৃথক বলা হয়েছে। কেননা দ্বীন আসে আল্লাহ্র নিকট থেকে ‘অহি’ হিসাবে। পক্ষান্তরে ‘রায়’ আসে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে, যা ধারণা প্রসূত। দ্বীন অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ‘রায়’ ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত ও পরিবর্তনযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছের ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বিষয়ে অহি-র বিধান পেশ করেননি। বরং নিজের ‘রায়’ পেশ করেছিলেন। যাতে ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল এবং বাস্তবেও তাই হয়েছিল। এ ধরনের আরও ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। এমনকি ছালাতের রাক‘আত গণনাতেও তিনি ভুল করেছেন। যার জন্য তাঁকে ছালাতের মধ্যে ‘সহো সিজদা’ দিতে হয়েছে। মানুষ হিসাবে এটাই ছিল তাঁর জন্য স্বাভাবিক। তিনি যে ‘নূরের নবী’ ছিলেন না, এটাও তার একটি বড় প্রমাণ।

ঘটনা : মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ নর খেজুরের ফুল নিয়ে মাদী খেজুরের ফুলের সাথে মিশিয়ে দেয়। তাতে খেজুরের ফলন ভাল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নিয়মটি পসন্দ করলেন না। ফলে লোকেরা এটা বাদ দিল। দেখা গেল যে, সেবার ফলন কম হ’ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদেরকে উপরোক্ত কথা বলেন। কেননা উক্ত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে ওটা ছিল তাঁর ‘রায়’ বা ধারণা প্রসূত। আল্লাহ্র অহি বা প্রত্যাদেশ ছিল না। বরং এ ধরনের বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ হ’ল ‘তুমি লোকদের সাথে পরামর্শ করো’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

উক্ত হাদীছের ঘটনা প্রমাণ করে যে, মানুষের দুনিয়াবী জীবন দ্বীনী জীবন থেকে পৃথক। যেমন মানুষের মাথা ও হাত-পা একে অপর থেকে পৃথক। এদের কর্মক্ষেত্র পৃথক। দায়িত্ব পৃথক। কিন্তু সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলছে তার মালিক একক ব্যক্তির নির্দেশে। অনুরূপভাবে মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন নিঃসন্দেহে পৃথক। কিন্তু সবই চলবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত একক ও অভ্রান্ত হেদায়াতের আলোকে। দ্বীনী বিষয়ের হুকুমগুলি অপরিবর্তনীয় (তাওক্বীফী)। যার খুঁটিনাটি কোন কিছু কমবেশী করার অধিকার বান্দার নেই। কিন্তু দুনিয়াবী বিষয়ে ইসলাম হালাল-হারামের কতগুলি সীমা ও মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই সীমারেখার মধ্যে থেকে ও সেইসব

মূলনীতির আলোকে মুসলমান নিজে বা পরস্পরে পরামর্শ সাপেক্ষে এবং অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যেমন 'সূদ' (الرِّبَا) একটি অর্থনৈতিক বিষয়, যা মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম একে 'হারাম' করেছে। বান্দা একে কোনভাবেই হালাল করতে পারে না। অতএব কিভাবে পুরা অর্থনীতিকে সূদমুক্ত করা যায় এবং পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে কিভাবে জাতিকে উদ্ধার করা যায়, সে বিষয়ে মুমিন বান্দারা পরস্পরে পরামর্শ মতে হাদীছের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে 'যাকাত' (الزَّكَاةُ) একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এটি 'ফরয'। একে বাতিল করার অধিকার বান্দার নেই। অতএব এটির সুষ্ঠু সংগ্রহ ও বণ্টনের মাধ্যমে কিভাবে সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যায়, তার পরিকল্পনা মানুষ গ্রহণ করবে। একইভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে শরী'আতের মূলনীতি ও সীমারেখার মধ্যে থেকে মুমিন বান্দাগণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারীগণ বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তথা ইসলামী শরী'আতের কোন নির্দেশ এবং কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ বা সীমারেখা মানতে রাযী নন। তারা নিজেদের ইচ্ছামত আইন রচনা করে থাকেন ও তা মানতে মানুষকে বাধ্য করেন। ফলে ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘর্ষ একেবারেই মুখোমুখি। সেখানে আপোষের কোন সুযোগ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ আল্লাহ্‌র পাশাপাশি স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ-এর আসনে বসিয়েছেন। যা শিরকের শামিল। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً-

'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ গণ্য করেছে? তুমি কি ঐ লোকটির কোন দায়িত্ব নিবে'? 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ লোক শুনে ও বুঝে? ওরা তো পশুর মত। বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*।

Contents

অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের নীতি (سلوك الإسلام الى غير المسلمين) :

(১) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একটি ইহূদী বালক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেবা করত। সে তাঁর ওযূর পানি এনে দিত ও জুতা গুছিয়ে দিত। একসময় সে পীড়িত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বাড়ীতে তাকে দেখতে গেলেন ও মাথার কাছে বসলেন। অতঃপর ছেলেটির শেষ অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি তাকে বললেন, তুমি ইসলাম কবুল কর'। ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ 'তুমি আবুল ক্বাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ 'আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা। যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[১৭]

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, নিজের বাড়ীর কাজের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) কখনো তাকে বা তার ইহূদী পরিবারকে ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি।

(২) ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে একবার তার খ্রিষ্টান গোলাম উসাক্বকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে অস্বীকার করে। তখন তিনি لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ('দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই') আয়াতাংশটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, يَا أُسَقُ لَوْ أَسْلَمْتَ، لاسْتَعَنَّا بِكَ عَلَى بَعْضِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ 'হে উসাক্ব! যদি তুমি ইসলাম কবুল করতে, তাহ'লে মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি তোমার নিকট থেকে সাহায্য নিতাম'।[১৮] অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২৬৯০)*।

---

১৭. আবুদাঊদ হা/৩০৯৫; আহমাদ হা/১৩৩৯৯; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ১৯ আয়াত।

১৮. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; তাফসীর ইবনু আবী হাতেম হা/২৬৫৪। সনদ যঈফ হ'লেও ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা হ'ল।

(৩) ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে ১৫ হিজরীতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় উপলক্ষ্যে ফিলিস্তীন যাওয়ার পথে তিনি ওযূর পানি তলব করেন। তখন রাস্তার পাশের এক বাড়ী থেকে তাঁকে পানি এনে দেওয়া হয়। অতঃপর ওযূ শেষে তিনি বললেন, কোথা থেকে এ পানি আনলে? কোন কুয়ার পানি বা বৃষ্টির পানি তো আমি এত সুমিষ্ট পাইনি। বলা হ'ল যে, ঐ বৃদ্ধা খ্রিষ্টান মহিলার বাড়ী থেকে এনেছি। তখন ওমর (রাঃ) তার কাছে গেলেন ও বললেন, أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ 'হে বৃদ্ধা! ইসলাম কবুল কর। (জাহান্নাম থেকে) বেঁচে যাবে। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন'। তখন বৃদ্ধা তার মাথা আলগা করে দেখালো কাশফুলের মত (مِثْلُ الثَّغَامَةِ) ধবধবে সাদা একরাশ চুল। অতঃপর বলল, وَأَنَا اَمُوْتُ الْآنَ 'আর আমি এখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছি'। একথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, اَللَّهُمَّ اشْهَدْ 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' (যে, আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি)। কুরতুবী বর্ধিতভাবে লিখেছেন, অতঃপর তিনি لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ আয়াতাংশটি পাঠ করলেন।[১৯]

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সে সময়কার খ্রিষ্টান বিশ্ব যে ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং যখন ফিলিস্তীনের খ্রিষ্টান নেতারা তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত, সে অবস্থায় তিনি একজন দুর্বল খ্রিষ্টান বৃদ্ধার প্রতিও ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি।

এরূপ অসংখ্য নযীর ইসলামী খেলাফতের পরতে পরতে রয়েছে। অথচ ইসলাম হ'ল মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন *(আলে ইমরান ৩/১৯, মায়েদাহ ৫/৩)*। আর ইসলাম কবুল না করলে মানুষকে অবশ্যই পরকালে জাহান্নামী হ'তে হবে।[২০] এরপরেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ),

---

১৯. বায়হাক্বী হা/১২৮ 'তাহারৎ' অধ্যায় ১/৩২ পৃঃ; দারাকুৎনী হা/৬০-৬১; কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত; আল-বিদায়াহ ৭/৫৬।

২০. মুসলিম হা/১৫৩ 'ঈমান' অধ্যায়, ৭০ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০।

খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরাম মানুষকে কেবল ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু কারু প্রতি চাপ প্রয়োগ করেননি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শাসনেই মাত্র অন্য ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ পায়। অথচ কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে ইসলামের প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। সেখানে মুসলমানদের গরু কুরবানী করতে বা মাইকে আযান দিতে, এমনকি একের অধিক সন্তান নিতেও নিষেধ করা হয়। মিথ্যা অজুহাতে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মুসলমান নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয় ও নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করা হয়। অতএব ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ অর্থ সব ধর্মের স্বাধীনতা নয় বা অসাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ হ’ল ইসলামকে প্রতিহত করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (العلمانية فى نظر الإسلام) :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দু’টি মৌলিক কারণে ইসলামের বিরোধী। ১. ‘তাওহীদে ইবাদত’ তথা দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করায় এটি পরিষ্কারভাবে কুফরী মতবাদ। ২. আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত বিধান দেওয়ায় এটি স্পষ্টভাবে ত্বাগূতী মতবাদ।

হাতে গোনা কিছু নাস্তিক ব্যতীত পূর্বকালের ও আধুনিক কালের তাবৎ কাফির ও মুশরিক সমাজ সকল ক্ষমতার অধিকারী একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এভাবে আল্লাহকে স্রেফ ‘রব’ হিসাবে স্বীকার করাকে বলা হয় ‘তাওহীদে রুবূবিয়াত’। পক্ষান্তরে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ কবুল করাকে বলা হয় ‘তাওহীদে ইবাদত’ বা উলূহিয়াত। তাই কেবল তাওহীদে রুবূবিয়াতকে স্বীকার করলেই কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন আবু জাহল আল্লাহকে ‘রব’ হিসাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাকে মুসলমান বলা হয়নি। তাই মুসলমান কেবল তিনিই হ’তে পারেন, যিনি ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করেন ও সাধ্যমত তাঁর আদেশ-নিষেধ সমূহ বাস্তবায়ন করেন।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বেশীর বেশী কেবল তাওহীদে রুবূবিয়াতকে স্বীকার করে। কিন্তু তাওহীদে ইবাদতকে কোন অবস্থাতেই স্বীকার করে না। এই

Contents

মতবাদ মানুষের উপরে মানুষের রচিত বিধান সমূহ চাপিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাসী। ফলে মানুষ মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। অথচ মানুষ কেবল তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দাসত্ব করতে এবং তাঁর বিধান মানতে বাধ্য, অন্য কারু নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিধান মান্য করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং রয়েছে তার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ক্ষেত্রসমূহ (مجالات العلمانية) :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলতঃ দু'টি ক্ষেত্রে কার্যকর : ধর্মীয় ক্ষেত্রে ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে।

(ক) ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (علمانية فى مجالات الدينية) : ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাওহীদে ইবাদতকে বিঘ্নিত করেন যুগে যুগে দুষ্টমতি ধর্মীয় নেতাগণ। যেমন নূহের কওম, ইবরাহীমের কওম, মূসা ও ঈসার কওমের নেতারা করেছিল। আল্লাহ ইহূদী-নাছারাদের পথভ্রষ্টতার কারণ নির্দেশ করে বলেন,

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَـــهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ- (التوبة ٣١)-

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম ও পীর-আউলিয়াদেরকে এবং মরিয়মপুত্র ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অথচ তাদের কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব করতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যে শিরক করে, তা হ'তে তিনি পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াত সম্পর্কিত ঘটনাটি নিম্নরূপ :

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا

مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ، وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، رواه ابن جرير في تفسيره واللفظ لحديث أبي كريب–

‘(তৎকালীন খ্যাতনামা খ্রিষ্টান ধর্মনেতা) ‘আদী বিন হাতেম হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি (৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে (ইসলাম কবুলের জন্য মদীনায়) আসি। এমতাবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুশ ঝুলানো ছিল। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে ‘আদী! তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন আমি ওটা খুলে ফেলে দিলাম এবং তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম। এ সময় তিনি সূরা তওবাহ্র (উপরে বর্ণিত ৩১) আয়াতটি পড়ছিলেন। আমি বললাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো ওদের ইবাদত করি না’। জবাবে তিনি বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ، وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ ‘তারা কি আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়গুলিকে হারাম করে না? অতঃপর তোমরাও সেগুলিকে হারাম কর। তারা কি আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়গুলি হালাল করে না? অতঃপর তোমরাও তা হালাল কর। ‘আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ‘ওটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’।

উক্ত হাদীছের ব্যাখায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوْهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا. وقَالَ الضَّحَّاكُ : يَعْنِي سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ، يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ–

‘ইহূদী-নাছারা ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে মানুষকে হুকুম দিতেন এবং লোকেরা তা

মান্য করত। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ হিসাবে অভিহিত করেন’। যাহহাক (মৃ. ৬৪ হি.) বলেন, ‘এখানে রব অর্থ তাদের নেতাগণ। লোকেরা আল্লাহ্র অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করত’।[২১]

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ...-

‘অবশ্যই আমার উম্মতের উপর এমন অবস্থা আসবে, যেমন এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপর, একজোড়া জুতার পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ন্যায়...’।[২২] ঐ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে ছালাতের প্রতি রাক‘আতে সূরা ফাতিহায় প্রার্থনা করতে হয়, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ‘(হে আল্লাহ!) তুমি আমাদেরকে সে পথে পরিচালিত করো না, যে পথে চলার কারণে লোকেরা অভিশপ্ত হয়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে’ *(ফাতিহা ১/৭)*।

‘আদী বিন হাতেম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘*মাগযূব*’ (অভিশপ্ত) হ’ল ইহূদীরা এবং ‘*যোয়াল্লীন*’ (পথভ্রষ্ট) হ’ল নাছারারা’।[২৩] অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থা বিগত ইহূদী-নাছারাদের ন্যায় হবে। তবে পার্থক্য এই যে, তারা তাদের নিকটে প্রেরিত এলাহী গ্রন্থ তাওরাত-ইনজীলকে পরিবর্তন করে তা একেবারেই বিকৃত ও বিনষ্ট করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা সেটা করতে না পেরে বহু ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের ‘তাবীল’ অর্থাৎ দূরতম ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করেছে। তাফসীরের নামে বহু বাজে গল্প রটনা করেছে। এমনকি সুযোগ মত হাদীছ তৈরী করে অথবা সেখানে কিছু যোগ-বিয়োগ করে ধর্মীয় বিধানকে নিজেদের মনমত করে নিয়েছে। ফলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বদলে মুসলিম জীবনের ধর্মীয় বিষয়গুলির বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার ধর্মনেতাদের রচিত বিধানসমূহ তাক্বলীদে শাখছীর নামে চোখ বুঁজে মান্য

---

২১. ইবনু জারীর, তাফসীর জামে‘উল বায়ান হা/১৬৬৩২, ১৬৬৪১, ১৬৬৩০; ঐ, (বৈরূত ছাপা : ১৯৮৭), ১০/৮০-৮১; ছহীহাহ হা/৩২৯৩; তিরমিযী হা/৩০৯৫ ‘তাফসীর’ অধ্যায় ‘সূরা তওবা’ অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান।

২২. তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।

২৩. তিরমিযী হা/২৯৫৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৮২০২।

করা হচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত বিধান সমূহ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মের নামে, যার পিছনে আল্লাহ্‌র কোন অনুমতি নেই।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হচ্ছে মৃত মানুষের পূজা। যা মূর্তি ও প্রতিমা পূজা রূপে কিংবা স্থানপূজা রূপে কাফির ও মুশরিক সমাজে চালু আছে। আজকাল সেগুলিই মুসলিম সমাজে চলছে মাযার ও কবরপূজা রূপে। চলছে ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা। চলছে কথিত শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদির পূজা। বলা হচ্ছে পীর-আউলিয়াগণ মরেন না। তারা কবরে জীবিত থাকেন ও ভক্তের আহ্বান শুনেন ও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন (নাঊযুবিল্লাহ)। বলা বাহুল্য, এভাবেই আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করা হচ্ছে ধর্মের নামে। আর এভাবেই চলছে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে এক অঘোষিত ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’।

(খ) বৈষয়িক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (علمانية فى مجالات الدنيوية) **:**

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মুসলমানদের অনেকে বিশুদ্ধভাবে ধর্মীয় বিধান মেনে চললেও বৈষয়িক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলছে অনৈসলামী বিধান সমূহ, যা আল্লাহ নাযিল করেননি। যেমন অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে আইনসিদ্ধভাবেই সূদ, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি হারামকে হালাল করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ– (المائدة ٥٠)–

‘তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধানসমূহ কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র চাইতে সুন্দর বিধানদাতা আর কে আছে’? *(মায়েদাহ ৫/৫০)*।

প্রথমোক্ত মতের লোকেরা শেষোক্ত লোকদের চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা প্রথমোক্ত লোকেরা তাদের শিরক ও বিদ‘আতগুলিকে ধর্ম ভেবেই করে থাকে। ফলে তারা তওবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত লোকেরা তাদের কাজগুলিকে অন্যায় ভেবেই করে। ফলে তাদের তওবা করার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

Contents

কুফরী বিধান (حكم الجاهلية) :

উপরে উদ্ধৃত সূরা মায়েদাহ ৫০ আয়াতে বর্ণিত ‘জাহেলিয়াতের বিধান’ (حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ) অর্থ কুফরী বিধান। এই কুফরী দু’ধরনের : বিশ্বাসগত কুফরী (كُفْرٌ اِعْتِقَادِىٌّ) ও কর্মগত কুফরী (كُفْرٌ عَمَلِىٌّ)।

(ক) বিশ্বাসগত কুফরী (كُفْرٌ اِعْتِقَادِىٌّ) **:** যেসব শাসক বা শাসক দল বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ অস্বীকার করেন অথবা সেগুলিকে ‘হক’ জানলেও পরিস্থিতি বা যুগের দোহাই পেড়ে নিজেদের রচিত বিধানকে উত্তম বা সমান বা সিদ্ধ মনে করেন, তারা বিশ্বাসগত কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ বলে গণ্য হবেন। অতএব তারা মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি দিলেই কিংবা ছালাত-ছিয়াম পালন করলেই মুসলিম গণ্য হবেন না। যেমন হারেছ আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

‘যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম’।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি কেবল কা‘বাগৃহে বসে দিনরাত ছালাত-ছিয়ামে রত থাকতেন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক ব্যাপারে কোন কথা না বলতেন, তাহ’লে কাফির ও মুশরিক সমাজ তাঁর বিরোধিতা করত না বা ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে তাঁকে এত কষ্ট সহ্য করতে হ’ত না। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রস্তাব অনুযায়ী মসজিদের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও পার্লামেন্টে গিয়ে আল্লাহকে ছেড়ে নেতাদের আনুগত্য, এ ধরনের দ্বিমুখী

২৪. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

আনুগত্যের দাবী তাওহীদে ইবাদতের সরাসরি বিরোধী। যারা দু’টিকে মিলিয়ে চলতে চান, তাদের এই আপোষমুখী ফর্মুলার বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَن يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَن يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً- أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَاباً مُّهِيْنًا- (النساء ١٥٠-١٥١)-

‘যেসব লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং বলে যে, আমরা কিছু অংশের উপরে ঈমান আনলাম ও কিছু অংশে কুফরী করলাম। এর দ্বারা তারা দু’য়ের মাঝে একটা (আপোষের) রাস্তা বের করতে চায়’। ‘এরাই হ’ল প্রকৃত ‘কাফির’। আর আমরা কাফিরদের জন্য নিকৃষ্টতম শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছি’ *(নিসা ৪/১৫০-১৫১)*।

অতএব উপরে বর্ণিত আক্বীদা ও বিশ্বাস যদি কোন নেতা বা দলের থাকে, তবে সেই নেতা বা দল ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য হবে। তাদের দলভুক্ত হওয়া কোন মুসলমানের জন্য সিদ্ধ নয়।

এক্ষণে যদি কোন মুসলিম সরকার কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করে, তবে সে সরকার মুনাফিক ও কবীরা গোনাহগার হবে। কিন্তু যদি সেটাকে আল্লাহ্র বিধানের চাইতে উত্তম বা সমান বা দু’টিই সিদ্ধ মনে করে ও তাতে খুশী থাকে, তাহ’লে উক্ত সরকার প্রকৃত ‘কাফের’ হিসাবে গণ্য হবে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

(খ) কর্মগত কুফরী (كُفْرٌ عَمَلِىٌّ) **:** যদি কোন শাসক বা শাসক দল আল্লাহ্র বিধানকে সর্বোচ্চ, সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্বযুগীয় এবং মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের জন্য কল্যাণবিধান বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং মুখে তা স্বীকার করে ও তা প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালায়, কিন্তু বাধ্যগত কারণে আল্লাহ্র কিছু হুকুম বাস্তবায়নে অক্ষম থাকে, তাকে

‘কর্মগত কুফরী’ বা কুফরে ‘আমলী বলে। তারা ইসলাম বিরোধী কোন বিধান জারি করলে তাদের উক্ত হুকুম মান্য করা সিদ্ধ হবে না। বরং তার প্রতিবাদ করতে হবে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে ও তাকে ঘৃণা করতে হবে। যদিও বিদ্রোহ করা যাবে না। কেননা তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا، لاَ مَا صَلَّوْا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

‘তোমাদের উপর অনেক শাসক নিযুক্ত হবে। যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি উক্ত অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফেকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে’।[২৫] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ ‘এমতাবস্থায় তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও’।[২৬]

উপরে বর্ণিত দুই অবস্থাতেই ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ একটি নিরেট কুফরী মতবাদ। ইসলামের সাথে এর আপোষের কোন সুযোগ নেই।

২৫. মুসলিম হা/১৮৫৪, শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৯; মিশকাত হা/৩৬৭১।
২৬. বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র (العلمانية والديمقراطية) :

ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে গণতন্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রথমে মুসলমানকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র তাকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে মানুষের মনস্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। যা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।[২৭] গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে যদি একটি মাকাল ফলের সাথে তুলনা করা যায়, তাহ'লে গণতন্ত্র হ'ল উপরের খোসা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হ'ল ভিতরের সারশূন্য অংশ। খোসা উল্টালেই ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসবে। সেকারণ গণতন্ত্রের রথে চড়ে কোন ইসলামী দল ক্ষমতায় গেলে পাশ্চাত্য তাকে 'মডারেট' (নমনীয়) বলে স্বাগত জানায়। কোন সামরিক নেতা ক্ষমতায় গেলেও তাকে মেনে নিতে দ্বিধা করে না। কারণ ক্ষমতায় গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতেই তারা দেশ চালাবে। আর এটাই হ'ল পাশ্চাত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি বিপুল জনসমর্থন নিয়ে কোন ইসলামী নেতা ক্ষমতায় যান, তাহ'লে তাঁকে সরানোর সবরকম চক্রান্ত তারা করে থাকে।

সংঘর্ষের প্রধান দিকসমূহ (الجوانب الرئسية للتصادم مع الإسلام) :

পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত সর্বশেষ দ্বীন হ'ল 'ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)* এবং ইসলামই বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র এলাহী ধর্ম। যা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে হেদায়াতের সর্বোত্তম আলোকবর্তিকা স্বরূপ। ফলে কথিত অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্মের অপূর্ণতা ও তাদের ধর্মযাজকদের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে সৃষ্ট 'ধর্মনিরপেক্ষ' মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মারাত্মক অন্যায়। বরং এটাই বাস্তব যে, কথিত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত এবং ইসলামই তাদের প্রধান টার্গেট।[২৮] নিম্নে ইসলামের সাথে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘর্ষের প্রধান দিকসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

---

২৭. এ বিষয়ে পাঠ করুন, মাননীয় লেখকের 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই। -*প্রকাশক*।

২৮. এ বিষয়ে পাঠ করুন, মাননীয় লেখকের 'উদাত্ত আহ্বান' বই। -*প্রকাশক*।

(১) ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল বিষয়ের হেদায়াত এতে মওজুদ রয়েছে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাইরে বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারে ধর্মের কোন আবশ্যকতা নেই।

(২) ইসলামের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ। আইন ও বিধানদাতাও তিনি। পার্লামেন্টের সদস্যগণ সেই আইনের বাস্তবায়ন করবেন মাত্র। প্রয়োজনে উক্ত আইনের অনুকূলে আরও বিধান রচনা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনের প্রতিকূলে কোন আইন রচনার অধিকার তাদের নেই। আর করলেও 'আমীর' বা প্রেসিডেন্ট তা বাতিল করবেন।

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। পার্লামেন্টে জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সেই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তারাই তাদের খেয়াল-খুশীমত আইন রচনা করবে। এখানে আল্লাহ্‌র আইনের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী হলেও সেটা তাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় নয়। কেননা এগুলো বৈষয়িক ব্যাপার। তাতে প্রেসিডেন্টের ভেটো দেওয়ারও এখতিয়ার নেই। জনপ্রতিনিধিদের অধিকাংশের রায় এখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে, আল্লাহ্‌র আইন নয়।

(৩) ইসলামের মতে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ঐ মাপকাঠি হ'ল মানুষের জ্ঞান। দল বা দলীয় নেতার সিদ্ধান্ত, General Will-এর নামে Party Will বা জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত কিংবা আদালতের রায়ই সেখানে চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানব জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানব জীবনকে ইসলামের বিধান মোতাবেক গড়ে তোলা।

(৫) ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের জীবনকে বিভক্ত মনে করে। পক্ষান্তরে ইসলাম মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে অবিভাজ্য মনে করে।

ধর্মনিরপেক্ষ আক্বীদার পরিণতি (نتيجة العقيدة العلمانية) :

(১) এই দর্শন মুসলিম জীবনকে দ্বীন ও দুনিয়া দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। অথচ তা পৃথক হ'লেও বিভক্ত নয়। যেমন হাত ও পা পৃথক হ'লেও তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই মুমিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি না বুঝার কারণেই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানদের মত মুসলমানদের মধ্যেও একটা সুবিধাবাদী ধর্মীয় শ্রেণী গড়ে উঠেছে। যারাই কেবল 'দ্বীনদার' হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। অথচ এটি মারাত্মক ভ্রান্তি।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ আক্বীদা পোষণের ফলেই মুসলমানেরা খুশী মনে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনে ইহূদী-নাছারাদের রচিত কুফরী আইনের গোলামী করছে। এই মতবাদ প্রচার করেই ইংরেজরা প্রায় দু'শো বছর ধরে শাসনশক্তি হারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় স্বাধীনতার সান্ত্বনা দিয়ে রাজনৈতিক গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। আজও নামকাওয়াস্তে ভৌগলিক স্বাধীনতা এলেও এবং শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইংরেজদের রেখে যাওয়া ত্বাগূতী আইনে শাসিত হচ্ছে এবং আইন ও বিচার বিভাগ সহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গোলামী করে যাচ্ছে। তাদের রেখে যাওয়া আইনেই আমাদের জেল-ফাঁস হচ্ছে। যে আইনে আখেরাতে মুক্তির কোন লক্ষ্য নির্ধারিত নেই।

(৩) এই আক্বীদা পোষণের ফলে একজন মুসলমান তার আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ্‌র আইন ও বৈষয়িক জীবনে মানব রচিত আইনের গোলামী করে। যা পরিষ্কারভাবে শিরকের পর্যায়ভুক্ত *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*।

(৪) এই আক্বীদা পোষণের ফলে একজন পাক্কা মুছল্লীও বৈষয়িক জীবনে হারাম-হালালের তোয়াক্কা করে না। তার দ্বীন তার দুনিয়াবী জীবনের উপরে কোন প্রভাব ফেলে না। সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী সবকিছুই তার নিকটে সিদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেননা এসবই তার দৃষ্টিতে স্রেফ দুনিয়াবী ব্যাপার। যেখানে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার নেই।

(৫) ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুসলমানরা ইসলামকে অপূর্ণ ও সেকেলে ভাবতে শুরু করেছে। অথচ ইসলাম হ'ল

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান *(মায়েদাহ ৫/৩)* এবং তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন’ *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ও ইসলামী দর্শনের বাস্তব ফলাফল

(النتيجة الواقعية للفلسفة العلمانية والإسلامية)

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার সিনেট ‘মদ্য নিবারক আইন’ (Prohibition law) পাশ করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে উক্ত আইন বাতিল করে। এই আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে চৌদ্দ বছরে ২০০ লোক নিহত হয়। ৫ লাখ ৩৪ হাযার ৩৩৫ জন কারারুদ্ধ হয়। ১ কোটি ৬০ পাউণ্ড জরিমানা করা হয় এবং ৪০ কোটি ৪০ লাখ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত আইনটি কার্যকর করতে ১৪ বছরে মার্কিন জাতিকে যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল, তার মোটামুটি পরিমাণ ৬৫ কোটি পাউণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Anti Saloon League নামক একটি সংস্থা কয়েক বছর ধরে পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রচারপত্র, ছায়াছবি, নকশা-চিত্র এবং অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে আমেরিকানদের মন-মগজে মদের অপকারিতাকে বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টা করেছিল। অনুমান করা হয় যে, আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত শুধু তাদের প্রচারকার্যেই ব্যয় হয়েছে সাড়ে ছয় কোটি ডলার এবং মদের অপকারিতা বিষয়ে প্রকাশিত বই-পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে নয়শ’ কোটির মত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘বিশ্ব-ইতিহাসের এই বৃহত্তম সংস্কার প্রচেষ্টা’ নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। কারণ এই নিষেধাজ্ঞা যতদিন কাগজপত্রে ও উপদেশের মধ্যে সীমিত ছিল, ততদিন মার্কিন জাতি তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখনই তা বাস্তবায়ন করতে যাওয়া হ’ল, তখনই তারা মদ হারানোর ভয়ে পাগলপারা হয়ে উঠলো। ফলে চৌদ্দ বছর পূর্বে তারা যেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তারাই তাকে পুনরায় সিদ্ধ করল।

নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে আমেরিকায় মদ চোলাইয়ের অনুমোদিত দোকানের সংখ্যা ছিল ৪০০। কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মাত্র ৭ বছরের মধ্যে ৭৯,৪৩৭ জন কারখানা মালিককে গ্রেফতার এবং ৯৩,৮৩১টি মদের

দোকান বাযেয়াফ্ত করা হয়। এটি ছিল সর্বমোট কারখানা ও দোকানের এক দশমাংশ মাত্র। আগে যা ছিল শহর কেন্দ্রিক, এখন তা গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অনুমান করা হয় যে, এই সময় মার্কিন জাতি বছরে অন্যূন ২০ কোটি গ্যালন মদ পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। কেবল নিউইয়র্ক শহরেই নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে যেখানে মদ্য পানে রোগাক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৭৪১ জন ও মৃতের সংখ্যা ছিল ২৫২ জন। সেখানে নিষিদ্ধ করার পরে ১৯২৬ সালে রোগাক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ হাযারে এবং মৃত্যু বরণকারীর সংখ্যা সাড়ে সাত হাযারে উন্নীত হয়। এতদ্ব্যতীত দেশে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাযানি, যেনা-ব্যভিচার, সমমৈথুন, পুংমৈথুন, জুয়া, সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি সকল প্রকার অপরাধের সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যায়। ফলে ১৯৩৩ সালে আমেরিকার Crime Council-এর ডাইরেক্টর কর্ণেল মোস (Col. Moss) বলেন, 'বর্তমানে আমেরিকার প্রতি তিন জনে একজন পেশাদার অপরাধী। অধিকন্তু আমাদের এখানে হত্যাকাণ্ডের অপরাধ শতকরা সাড়ে তিনশ' ভাগ বেড়ে গিয়েছে'।

এবারে দেখুন পৃথিবীর অন্য গোলার্ধের আরেকটি সমাজ চিত্র। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে অন্ধকার যুগে চিরকাল মদ্যপানে অভ্যস্ত আরব জাতি ইসলাম গ্রহণ করার পরে যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার ইলাহী নির্দেশ লাভ করল[২৯] সঙ্গে সঙ্গে তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পরিত্যাগ করল। মুখে নেওয়া মদের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল, কেউ গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে দিল। নিজ হাতে মদের ভাণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। মদীনার অলি-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গেল। কেবলমাত্র ঘোষকের একটি ঘোষণা, أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ 'সাবধান! মদ নিষিদ্ধ হয়েছে'। ব্যস তাতেই মদীনা থেকে মদ বিলুপ্ত হ'ল।[৩০] ভবিষ্যতে কেউ মদ খেলে তাদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হ'ল'।[৩১]

---

২৯. বাক্বারাহ ২/২১৯; নিসা ৪/৪৩; মায়েদাহ ৫/৯০।

৩০. বুখারী হা/৪৬২০; মুসলিম হা/১৯৮০; ইবনু কাছীর, সূরা মায়েদাহ ৯০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩১. বুখারী হা/৬৭৭৬; মুসলিম হা/১৭০৬; মিশকাত হা/৩৬১৪-১৬ 'দণ্ডবিধিসমূহ' অধ্যায় 'মদ্য পানের শাস্তি' অনুচ্ছেদ।

উপরে দু'টি সমাজচিত্র তুলে ধরা হ'ল। একটি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আধুনিক সভ্যতাগর্বী আমেরিকার। অন্যটি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মদীনায় ইসলামী শাসনের সূচনাকালের। যখনকার মানুষ নারী ও মদে চুর হয়ে থাকত। আরবী ভাষায় কেবল মদেরই আড়াইশ' শব্দ ছিল। এতেই বুঝা যায়, মদ তাদের সমাজ জীবনকে কিভাবে গ্রাস করেছিল। অথচ সেই মদে অভ্যস্ত লোকগুলিকে মদ থেকে ফিরানোর জন্য কোন প্রচারণা চালানো হয়নি। Anti saloon league-এর ন্যায় কোন সমিতি গঠন করে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা বাবত একটি পয়সাও ব্যয় করা হয়নি। কোনরূপ যবরদস্তি বা অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি। মদের অপকারিতা বুঝানোর জন্য সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বা যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে হয়নি। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বলে খ্যাত আমেরিকা এ ব্যাপারে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'ল। এর অন্তর্নিহিত কারণ তালাশ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামের মধ্যকার নিম্নোক্ত মৌলিক দু'টি পার্থক্য ফুটে উঠবে। যেমন-

(১) ধর্মনিরপেক্ষতার মতে মানুষের পার্থিব বিধি-বিধান নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে তাদের খেয়াল-খুশীর উপরে। তাই ছোট-বড় সকল ব্যাপারেই তাদেরকে জনগণের সম্মতি নিতে হয়। কেননা জীবন পরিচালনার জন্য কোন স্থায়ী মানদণ্ড তাদের কাছে নেই। ফলে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আজ যাকে সঠিক বলছে, কাল তাকেই বেঠিক বলছে। একারণেই চৌদ্দ বছর পূর্বে যে মার্কিন জাতি মদ নিষিদ্ধের পক্ষে মত দিয়েছিল, পরে তারাই তার বিপক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করল। বলা বাহুল্য, এখানেই হ'ল গণতন্ত্রের ব্যর্থতা। যেখানে সঠিক-বেঠিক যাই-ই হৌক, অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। এখানে হুজুগই মানদণ্ড। যা একটি জংলী মতবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে ইসলামের রয়েছে একটি চির সত্য ও সুদৃঢ় মানদণ্ড। যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের ছোট-বড় প্রায় সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে'।[৩২] এতদ্ব্যতীত যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব তাকে ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হয়।[৩৩] সেখানে কোন মুমিনের জন্যই নিজস্ব

৩২. ইউনুস ১০/৩, ৩১; রা'দ ১৩/২; সাজদাহ ৩২/৫।

৩৩. নিসা ৪/৮২; মুহাম্মাদ ৪৭/২৪; বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/১৭১৬; মিশকাত হা/৩৭৩২ 'বিচারকার্য পরিচালনা ও তাতে সাবধানতা' অনুচ্ছেদ।

এখতিয়ারের কোন সুযোগ নেই *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। নেই কুরআন-হাদীছের উপরে 'অধিকাংশের রায়' বা কারু নিজস্ব রায় চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার *(আন'আম ৬/১১৬)*। ফলে যখনই তাকে মদ হারামের নির্দেশ শুনানো হয়েছে, তখনই সে তা পালন করেছে বিনা বাক্য ব্যয়ে খুশী মনে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জীবন পরিচালনায় ও বিধান প্রদানে আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। ফলে তাদের পুরো জীবনটাই পরিচালিত হয় প্রবৃত্তিপূজা ও স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে সর্বাগ্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের উপরে এবং পরকালে জওয়াবদিহিতার উপরে ঈমান আনার আহ্বান জানায়। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত এই তিনটি মূল ভিত্তির উপরে ঈমান আনার সাথে সাথে এলাহী বিধানসমূহের আনুগত্য করা মুমিনের উপরে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই মদ কেন তার চাইতে লোভনীয় কোন বস্তু এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিতেও সে পিছপা হয় না।

তাওহীদ বিশ্বাসের ফলাফল (ثمرة عقيدة التوحيد) :

এ বিশ্বাসের ফল হিসাবে মুমিনের সারাটি জীবন দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। হাযারো ঝড়-ঝঞ্ঝায় তার জীবনতরী লক্ষ্যচ্যুত হয় না। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ ইসলামে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তির তুলনা দিয়েছেন একটি পবিত্র বৃক্ষ ও একটি অপবিত্র বৃক্ষের সাথে *(ইবরাহীম ১৪/২৪-২৬)*। যেখানে তিনি বলেন, (১) পবিত্র বৃক্ষটির কাণ্ড হয় মযবুত (অর্থাৎ তার ঈমান হয় দৃঢ়) (২) বৃক্ষটি থাকে আবর্জনামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। (৩) বৃক্ষটির শাখাসমূহ থাকে আকাশের দিকে ধাবমান (অর্থাৎ মুমিনের সৎকর্মসমূহ সর্বদা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হয়)। (৪) পবিত্র বৃক্ষের ফল সর্বদা উপকারী (অর্থাৎ মুমিনের কথা ও কর্ম সর্বাবস্থায় কল্যাণকর)। (৫) বৃক্ষটি সর্বদা দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস ও তার উপরে ভরসায় মুমিন সর্বদা দৃঢ় থাকে)।

পক্ষান্তরে (১) অপবিত্র বৃক্ষের কাণ্ড হয় ভাসমান। (২) (দুনিয়াবী স্বার্থের) আবর্জনা দ্বারা দুষ্ট। (৩) তার শাখাসমূহ থাকে নিম্নমুখী (অর্থাৎ তার কর্মফল দুনিয়াতেই থাকে। আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয় না)। (৪) তার ফল

সর্বদা ক্ষতিকর (অর্থাৎ তার কথা ও কর্ম সর্বাবস্থায় কপট ও অকল্যাণকর)। (৫) বৃক্ষটি সর্বদা নড়বড়ে (অর্থাৎ সে দুনিয়াতে থাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান এবং কবরে হয় লা-জওয়াব)। আল্লাহ বলেন,

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ-

'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য (কালেমা শাহাদাত) দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে (কবরে) এবং সীমালংঘনকারীদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন' *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*।

উক্ত আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ যতই উন্নতি করুক, আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় ঈমান ও তাঁর বিধানের প্রতি বাস্তবে আনুগত্যশীল না হওয়া পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হ'তে পারে না এবং নিজের বল্গাহীন প্রবৃত্তির গোলামী থেকে সে মুক্ত হ'তে পারে না। ফলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কায়েম হ'তে পারে না।

মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ (سبب انحطاط المسلمين) :

অনেকে খেলাফত হারানো তথা রাজনৈতিক পরাজয়কে মূল কারণ বলেন। কিন্তু আমরা মনে করি এর মূল কারণ হ'ল মুসলমানদের ঈমান হারানো এবং ইসলাম থেকে সরে যাওয়া। তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য না বুঝা এবং ইসলামকে স্রেফ কিছু আচার সর্বস্ব দ্বীন মনে করা। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইসলামের মৌল আক্বীদা বিষয়ে খুব কমই শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্যের গরল স্রোতে ভেসে চলেছে। যার পরিণতিতে নামধারী মুসলিমদের যবান ও কলম দিয়ে সর্বদা কুফরী কালাম বের হচ্ছে। তারা কুফরী সংস্কৃতি লালন করছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা কুফরী আইনে শাসিত হচ্ছে। তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ইসলামকে জানা ও সেদিকে ফিরে আসা। তাহ'লে হৃত সম্মান ও শক্তি সবকিছু ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর রাজনৈতিক দর্শন

(الفلسفة السياسية لأهل الحديث وأهل الرأى)

বাংলাদেশের মুসলমানগণ দু’টি দর্শনে বিভক্ত। (১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যারা জীবন পরিচালনা করেন, তারা ‘আহলুল হাদীছ’ বা ‘আহলেহাদীছ’ নামে পরিচিত। (২) পূর্বসুরী কোন বিদ্বানের রচিত ফিক্বহী উছূল বা ব্যবহারিক আইনসূত্রের আলোকে যারা জীবন পরিচালনা করেন, তারা ‘আহলুর রায়’ বা ‘হানাফী’ নামে পরিচিত।

উভয় দর্শনই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক দর্শনগত পার্থক্য। আহলেহাদীছগণ সকল বিষয়ে অহি-র বিধানকে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করেন এবং মানবীয় জ্ঞানকে তার ব্যাখ্যাকারী ও সহযোগী মনে করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁরা তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী (LITERALIST) উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেন।

পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণ সকল ক্ষেত্রে মাযহাবী আক্বায়েদ ও ফিক্বহের তাক্বলীদ করেন এবং ব্যবহারিক ও আইন রচনার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বসুরীদের রচিত উছূলে ফিক্বহের অনুসরণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ : (১) বাংলাদেশের আহলুর রায় হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের নিকটে ‘আল্লাহ নিরাকার’ এবং শেষনবী ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী’। (২) তারা তাদের অনুসৃত মাযহাবী ফিক্বহের প্রতি এবং নিজ মাযহাবের ইমাম ও তরীক্বার পীরের প্রতি অন্ধ তাক্বলীদ লালন করেন ও মাযহাব মান্য করাকে ‘ফরয’ বা অপরিহার্য বলেন। ফলে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের বিধান মানতে তারা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। (৩) মাযহাবী আনুগত্যের কারণে তারা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাতও আদায় করতে পারেন না। এমনকি কুরআনী বিধানও মানতে পারেন না।

যেমন (ক) ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান (১৯০৭-১৯৭৪ খৃ.) এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার বিদ‘আতী তালাকের বদলে তিন তালাককে তিন মাসে দেওয়ার কুরআনী বিধান *(বাক্বারাহ ২/২২৮)* জারি করেন। আহলেহাদীছগণ উক্ত আইন সমর্থন করেন। কিন্তু হানাফী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র

আন্দোলন করে। যদিও আইয়ূব খান তা মানেননি এবং আজও তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে উক্ত পারিবারিক আইন চালু আছে। যা বহু মুসলিম দম্পতিকে সাক্ষাৎ ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

(খ) ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারী বাংলাদেশের হাইকোর্ট হানাফী সমাজে প্রচলিত 'হিল্লা' বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং ঐ সাথে সকল প্রকার ফৎওয়া প্রদানকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ফলে হানাফী মাযহাবভুক্ত সকল ইসলামী দল এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। যদিও এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা কুরআনী নির্দেশ[৩৪]-এর বিরোধী এবং তার মন্দ পরিণতিতে 'হিল্লা' বিবাহের নামে জাহেলী যুগের নোংরা প্রথাকে সিদ্ধ করা স্পষ্টভাবেই ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৩৫] 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হিল্লা বিবাহের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দেওয়া রায়কে সমর্থন করে। কিন্তু একে অজুহাত করে সকল প্রকার ফৎওয়া প্রদানকে বে-আইনী ঘোষণার প্রতিবাদ করে।[৩৬]

উল্লেখ্য, যে ওমর (রাঃ)-এর দোহাই দিয়ে এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করা হয়েছে, তিনিই এজন্য লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[৩৭] এর দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন যেন মানুষের মধ্যে তালাকের প্রবণতা কমে যায়। কিন্তু তা হয়নি। সেজন্য তিনি কঠোরভাবে হুমকি দিয়ে বলতেন, لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إلاَّ رَجَمْتُهُمَا 'আমার কাছে কোন হিল্লাকারী পুরুষ ও নারীকে আনা হ'লে আমি উভয়কে রজম করব (অর্থাৎ বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে হত্যা

---

৩৪. বাক্বারাহ ২/২২৯; তালাক ৬৫/১।

৩৫. لَعَنَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَــهُ দারেমী হা/২২৫৮; নাসাঈ হা/৩৪১৬; তিরমিযী হা/১১১৯-২০; ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৪-৩৫; মিশকাত হা/৩২৯৬ 'বিবাহ' অধ্যায় 'তিন তালাকপ্রাপ্তা' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ হা/৪০৬২। এ বিষয়ে পাঠ করুন, মাননীয় লেখকের 'তালাক ও তাহলীল' বই। *-প্রকাশক।*

৩৬. দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১ পৃঃ ৪২; দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ১৪, ১৫ই জানুয়ারী ২০০১।

৩৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৪০৩/১৯৮৩) ১/২৭৬ পৃঃ।

করব)'। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ 'হিল্লা করা ব্যভিচার। যদি তোমাদেরকে ওমর পেতেন, তাহ'লে রজমের শাস্তি দিতেন'।[৩৮] তিনি বলতেন, كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা হিল্লা করাকে ব্যভিচার গণ্য করতাম'।[৩৯] এমনকি তারা এভাবে বিশ বছর একত্রে বসবাস করলেও।[৪০]

এছাড়াও উপমহাদেশে চালু রয়েছে পীরপূজা ও কবরপূজা সহ হাযারো রকমের শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ। যার প্রায় সবগুলিই ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে এবং রাজনৈতিক দলগুলি এসবকে তাদের ভোটের পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে। অথচ ইসলামের সাথে এসবের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ফলে দেশের আইন রচনা ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয় দর্শনের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষেত্রে মিলনের একটাই পথ খোলা রয়েছে। সেটা হ'ল, মাযহাবী তাক্বলীদ পরিত্যাগ করে সালাফে ছালেহীন ও মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা করা এবং সকল বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে মেনে নেওয়া। আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগ যুগ ধরে এ পথেই উম্মতকে আহ্বান জানিয়ে এসেছে এবং আজও সে আহ্বান অব্যাহত রেখেছে। তাদের রাজনৈতিক দর্শন হ'ল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালিত করা'। তাদের লক্ষ্য হ'ল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালন।

---

৩৮. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৩৬৩, ১৭৩৬৫, সনদ ছহীহ; আলবানী, ইরওয়া হা/১৮৯৮, ৬/৩১১; বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৯, ১৩৯৬৮, ৭/২০৮।

৩৯. হাকেম হা/২৮০৬, ২/১৯৯ পৃঃ, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/১৮৯৮।

৪০. ইরওয়া হা/১৮৯৮-এর আলোচনা, ৬/৩১১ পৃঃ। দুঃখের বিষয়, এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, 'হ্যাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হইয়া যদি কেহ প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে সে পুণ্য লাভ করিবে। হাদীছ তাহার প্রতি প্রযোজ্য নহে' (বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ হা/৪০৬২-এর ব্যাখ্যা, ৬/৩২৩ পৃঃ)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল (النتيجة السيئيه للعلمانية) :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রধান কুফল হ'ল মানুষকে দুনিয়াসর্বস্ব স্বার্থপর জীবে পরিণত করা। এই মতবাদের মূল কথাটি নিম্নের বাক্যে নিহিত রয়েছে।-

Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. ('ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র')।

বৃটিশ বেনিয়া দার্শনিকদের শিখানো 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামক এই মতবাদটি সাফল্যজনক ভাবে চালু করার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা সদ্য শাসনহারা মুসলিম শক্তিকে হতোদ্যম করতে এবং ১৯০ বছর যাবৎ বাংলাদেশ সহ পুরা ভারতবর্ষকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে উপমহাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি স্বাধীন দেশ থাকা সত্ত্বেও সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি চালু না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল উপরোক্ত মতবাদ। ফলে মুসলিম দেশে বসবাস করেও আমরা অনৈসলামী আইনে শাসিত হচ্ছি।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশ তাদের জনগণের লালিত আক্বীদা-বিশ্বাস এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মোতাবেক রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলে ও সেই অনুযায়ী তা পরিচালিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম দেশগুলির জন্য যে, এই দেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় তাদের নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিফলন নেই। বরং দেশের সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ও ছত্রে অনৈসলামী শাসন দর্শনের গোলামীর চেহারা প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জাহেলী আরবের কাফেররাও যেখানে আল্লাহ্র নামে শপথ নিত, সেখানে আমাদের দেশের মুসলিম এম.পি-মন্ত্রীরাও আল্লাহ্র নামে শপথ নেন না।[৪১]

৪১. প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও সংসদ সদস্যসহ সকলের ক্ষেত্রে সংবিধানে একই শপথবাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, 'আমি সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, ...'। কিন্তু কার নামে শপথ করছি, সেকথা বলা হয়নি। দ্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, তৃতীয় তফসিল, ১৪৮ অনুচ্ছেদ, শপথ ও ঘোষণা পৃঃ ১৪৬।

তথাকথিত উদারতাবাদের দোহাই পেড়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ নামক উক্ত মতবাদটির প্রচলন ঘটানো হয়েছে। যার মূল কথাই হ’ল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় আইন চলবে না, বরং পার্লামেন্টের গুটিকয়েক গুণী বা নির্গুণ সদস্য কিংবা সামরিক ডিক্টেটর প্রেসিডেন্ট নিজের খেয়াল-খুশীমত যা আইন করে দেবেন, সেটাই দেশের আইন বলে মেনে নিতে হবে। পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত অন্য যতগুলি ধর্ম রয়েছে, কারু নিকটে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত রাষ্ট্রদর্শন বা অর্থনৈতিক হেদায়াত মওজুদ নেই। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র উক্ত মতবাদটি মূলতঃ ইসলামকেই মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে বের করে দিয়ে আন্তর্জাতিক কুফরী চক্রের গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ করার জন্য ফাঁদস্বরূপ তৈরী করা হয়েছে।

এই দর্শনের মারাত্মক কুফল হিসাবে মুসলমান তার ধর্মীয় জীবনে ইসলামী বিধান ও বৈষয়িক জীবনে মানুষের মনগড়া বিধান মান্য করে। আর এভাবেই সে নিজের জ্ঞান ও প্রবৃত্তিকে ইলাহ-এর আসনে বসায়। এই দর্শনের ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের নেতারা রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে শিরকী কালাম উচ্চারণ করে বলেন, ‘জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস’, ‘অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত’। একই কারণে সূদভিত্তিক হারামী অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করতে এবং দেশবাসীকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হারামখোর বানাতেও আমাদের মুসলিম নেতাদের অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রকম্পিত হয় না, যেহেতু এগুলি বৈষয়িক ব্যাপার। এতে আল্লাহ্‌র কোন বিধান মানা চলবে না।

পক্ষান্তরে যারা দেশের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না বরং সারা বছর বিদ‘আতী দাওয়াতে ঘুরে বেড়ান ও বছরে একদিন ‘আখেরী মুনাজাতে’ লাখো মানুষের ঢল নামান,[৪২] কিংবা আলীশান

---

৪২. ‘আখেরী মুনাজাত’ নামে পরিচিত দলবদ্ধ মুনাজাত একটি বিদ‘আতী প্রথা মাত্র। মক্কার মাসজিদুল হারামে, মদীনার মসজিদে নববীতে বা হজ্জের ময়দানে কোথাও এর কোন অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের মুনাজাতে আত্ম নিবেদনের চাইতে ‘রিয়া’ থাকে বেশী। হাদীছে একাকী মুনাজাতের কথা এসেছে, দলবদ্ধ মুনাজাত নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

খানক্বাহে বসে মা'রেফাতের সবক দেন, কিংবা বার্ষিক ওরস-ঈছালে ছওয়াব ও প্রাত্যহিক নযর-নেয়াযের দৈনিক ব্যালান্স হিসাব করায় সদা ব্যস্ত থাকেন, তাঁরাই এদেশে ধার্মিক ও দ্বীনদার বলে খ্যাত। জানিনা এঁরা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর মহান খলীফাগণকে 'দ্বীনদার' বলবেন না 'দুনিয়াদার' বলবেন!

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (العلمانية فى بنغلاديش) :

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে। যদিও এ চারটি মূলনীতি প্রথমে ছিল না। পরে ভারতীয় সংবিধান থেকে এনে যোগ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দিয়ে সেখানে 'আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস' সংযোজন করা হয়। আরও পরে ১৯৮৮ সালের ৯ই জুন ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করা হয়। কিন্তু এর কোন প্রতিফলন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নেই। বাস্তবে এখন চলছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদ। যার প্রতিটিই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নয়, বরং দুনিয়াপূজাই এদেশের রাজনীতির লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। যার কারণে দেশের ক্রমবর্ধমান অধঃপতন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে দু'ধরনের আন্দোলন চলছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'ইসলামী'। প্রত্যেকটিই দু'ভাগে বিভক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির প্রথম ভাগে রয়েছেন তারাই, যারা ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে মান্য করেন। কিন্তু বৈষয়িক তথা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবনে মান্য করেন না। মূলতঃ এই দলের লোক সংখ্যাই বাংলাদেশে বেশী। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন তারাই, যারা ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে ধর্মকে অস্বীকার করেন। এরা বামপন্থী, নাস্তিক বা কম্যুনিষ্ট বলে খ্যাত।

ইসলামী দলগুলিও মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ মাযহাবী তাক্বলীদের অনুসারী। যাদের সংখ্যাই এদেশে বেশী। তাঁরা নিজেদের আচরিত মাযহাব ও তরীক্বা অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন চান।

অন্য ভাগে রয়েছেন তাঁরাই যারা নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন

চান। এঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। তুলনামূলকভাবে এঁদের সংখ্যা কম হলেও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এঁদের সংখ্যা সর্বাধিক।[৪৩]

আজকাল ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সঙ্গে জোট করাকে রাসূল (ছাঃ)-এর 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'-র সঙ্গে তুলনা করছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেদিন কোন কুফরী দর্শন বা ত্বাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করেননি। কেবল প্রতিপক্ষের আপত্তির কারণে নিজের নামের শেষে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখে কাফিরদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। অথচ ইসলামী নেতাগণ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পার্টনার হয়ে কুফরী দর্শন ও অসংখ্য ত্বাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করে চলেছেন। সেজন্য তাঁরাও ধর্মনিরপেক্ষ দলভুক্ত বলে গণ্য হবেন।[৪৪] তারা বিশ্বাসগত কুফরীতে লিপ্ত না হ'লেও কর্মগত কুফরীতে লিপ্ত হয়েছেন। ফলে ইসলামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নৈতিক সাহস ও সুযোগ দু'টিই তারা হারিয়েছেন। আপোষ করার কৈফিয়ত হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর হোদায়বিয়ার সন্ধির দোহাই দিয়ে তারা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। ফলে তারা অধিকতর গোনাহের শিকার হচ্ছেন।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী বিধান সঠিক না বেঠিক, তা কল্যাণকর না অকল্যাণকর, সেটি জানার জন্য জনমতের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটাই যে মানবতার কল্যাণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ কল্যাণবিধান, সেকথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন এবং বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণী মানুষ একবাক্যে তা স্বীকার করেছেন। জনমত প্রয়োজন কেবল এজন্য যে, দেশবাসী নিজেদের কল্যাণের জন্য একে গ্রহণ

---

৪৩. বর্তমানে প্রায় তিন কোটি বলে অনুমান করা হয়।

৪৪. কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের দলভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ হা/৪১৫৩; ছহীহুল জামে' হা/২৮৩১)*।

ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে কি-না? যেমন মতামত প্রয়োজন হয় রোগী তার আরোগ্যের জন্য ঔষধ খাবে কি-না?

জনমত ও গণতন্ত্রকে এক মনে করার উপায় নেই। কেননা প্রচলিত গণতন্ত্রে কেবল জনমত যাচাই হয় না, বরং বিধান প্রবর্তন ও পরিবর্তনের স্বাধীনতা থাকে। ইসলাম জনমতকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু বিধান পরিবর্তনের অনুমতি দেয়নি। যেমন রোগীর ঔষধ খাওয়া না খাওয়ার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু ঔষধ পরিবর্তনের অনুমতি নেই।

অতএব বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয়, বাতিলের মুকাবিলা করেই এ পথে পা বাড়াতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বত্র একদল সচেতন ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী গঠন করা। ব্যাপক জনমত ও শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমেই কেবল দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা সম্ভব। প্রকৃত আহলেহাদীছগণ সর্বদা সেপথেই মানুষকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন।

অনেকের ধারণা, ইলেকশন করাটাই রাজনীতি। এর বাইরে রাজনীতি হয় না। অথচ এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। কেননা রাজনীতির মূল বিষয়টি হল, একটি নির্দিষ্ট আক্বীদা-বিশ্বাসের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। সংগঠিত জনমতই জনশক্তিতে পরিণত হয়। যার মাধ্যমে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি সবই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশের অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতা জীবনে কখনো ইলেকশন করেননি বা এম.পি-মন্ত্রী হননি। অথচ তাঁরাই দেশের রাজনীতিকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বর্তমান যুগে মেয়াদ ভিত্তিক ও প্রার্থীভিত্তিক ভোটাভুটির গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের পাতানো ফাঁদ মাত্র। এর ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় চরম অনৈক্য, বিশৃংখলা ও হানাহানি। তাছাড়া এর মাধ্যমে বিদেশী শক্তি বিভিন্ন দেশে তাদের বশংবদ লোকদের ক্ষমতায় বসানোর সুযোগ নিয়ে থাকে। একমাত্র ইসলামী রাজনীতি ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যেই সামাজিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং দেশের স্বাধীনতা দেশী ও বিদেশী শক্তির হামলা থেকে আল্লাহ্‌র রহমতে নিরাপদ থাকে।[৪৫]

---

৪৫. এ বিষয়ে পাঠ করুন, মাননীয় লেখকের ‘ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন’ বই। -*প্রকাশক*।

ঐক্যের সমস্যা সমূহ ও তা সমাধানের প্রস্তাব

(مشاكل الإتحاد والاقتراح فى حلها)

বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হ'লেও এখানকার জনগণের মধ্যে প্রধানতঃ চারটি দর্শনের সংঘাত রয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ (১) ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনে ধর্মহীন। (২) ধর্মীয় জীবনে স্বাধীন। বৈষয়িক জীবনে ধর্মহীন। (৩) উভয় জীবনে মাযহাবী শাসন চান। (৪) উভয় জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ শাসন চান। এগুলিই আবার অসংখ্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল-উপদলের জন্ম দিয়েছে। যাদের পরস্পরের মধ্যে দলীয় অহমিকা ও রেষারেষি এত বেশী যে, কোন একটি মৌলিক ইস্যুতেও তাদেরকে এক হয়ে কাজ করতে দেখা যায় না। ফলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় উন্নয়নের মৌলিক প্রশ্নে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি একক দৃষ্টিভঙ্গিতে আসতে পারেনি, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার মৌলিক প্রশ্নেও তেমনি ইসলামী দলগুলি একক দৃষ্টিভঙ্গিতে আসতে পারেনি।

এখানে জাতীয় ঐক্যের জন্য মৌলিকভাবে দু'টি পথ আমাদের জন্য খোলা রয়েছে। ১- দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় উন্নয়ন। ২- ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা। দু'টিই ঈমানী প্রশ্ন এবং জনমত যাচাই করলে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত দু'টি প্রশ্নে এদেশের অধিকাংশ জনগণের রায় পাওয়া যাবে। অতএব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্নকারী ভিতর ও বাইরের যেকোন চাপ ও বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একইভাবে জাতীয় উন্নয়ন বিঘ্নিত হ'তে পারে, এরূপ যাবতীয় কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে। স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি বলে দেশের জনগণকে বিভক্ত করা যাবে না। সাথে সাথে হরতাল-অবরোধ, গাড়ী ভাংচুর, বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহতকারী যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে ও তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা। আমরা মনে করি, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মৌলিক প্রশ্নে ইসলামী দলগুলির নেতৃবৃন্দ পরস্পরে সহনশীল হবেন। তাঁদের পক্ষ হ'তে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' থাকবে। যারা ইসলামী আইনের রূপরেখা কি হবে এবং বিভিন্ন মৌলিক ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা কিভাবে রাখা যাবে, সে বিষয়ে তারা নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। একই সাথে তাদের একটি 'লিয়াজোঁ কমিটি' থাকবে, যারা সর্বদা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখবেন ও তাদেরকে ইসলামী আইনের কল্যাণকারিতা বিশদভাবে বুঝাতে চেষ্টা করবেন। এর ফলে সকল দলের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। নিদেনপক্ষে পারস্পরিক রাজনৈতিক সহনশীলতা বজায় থাকবে। যা সামাজিক স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে ইনশাআল্লাহ।

মুমিনের করণীয় (واجب المؤمن) :

প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামের নীতি নয়। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয়। অতএব অমুসলিম বা ফাসেক মুসলিম সরকার উভয় শাসনামলে মুমিনের করণীয় হবে- (১) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। (২) বৈধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। (৩) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা ও তার ভাল কাজের প্রশংসা করা। (৪) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা। (৫) চূড়ান্ত অবস্থায় যালেম সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা।

একজন মুমিন যেখানেই বসবাস করুন, সর্বদা তার জিহাদী চেতনা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' (*আলে ইমরান ৩/১১০*) তথা 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর মূলনীতি থেকে তিনি মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকতে পারবেন না। এজন্য তাকে নিরন্তর দাওয়াত ও সংস্কার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এককভাবে ও সংগঠিতভাবে। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য শরী'আতে কঠোর নির্দেশ এসেছে। সে হিসাবে ইসলামী সংগঠনসমূহ সরকারের যেকোন

অনৈসলামী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইছলাহের উদ্দেশ্যে চাপ প্রদানকারী সংস্থা (Pressure Organization) হিসাবে কাজ করবেন। এভাবেই সমাজে ক্রমে স্থায়ী পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনৈসলামী শাসনের সহযোগী হওয়া যাবে না।

বর্তমানে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এবং ‘বড় ক্ষতির বদলে ছোট ক্ষতি বরণ করার’ (أَخَفُّ الضَّرَرَين) নীতির আলোকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের সহযোগী হওয়াকে ‘জায়েয’ বলছেন। কেউ ‘ইসলামের দিকে হুকুমতকে ফিরিয়ে আনার শর্তে’ একে ‘ওয়াজিব’ বলছেন। কিন্তু আমরা নবীগণের জীবনে এর বিপরীতটাই দেখেছি। তাঁরা বাতিল সমাজে বসবাস করেও কখনো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। তারা সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টায় বারবার নির্যাতিত হয়েছেন, হিজরত করেছেন, অনেকে নিহত হয়েছেন। আমাদের নবী (ছাঃ) বাতিল নেতাদের কাছ থেকে নেতৃত্বের টোপসহ নানাবিধ লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে দেশ থেকে হিজরত করেছেন।

আমরা কি তাহ’লে ধর্মনিরপেক্ষ একটা চেয়ারের জন্য ইসলামকে কুরবানী দেব? আর এই কাজে নেতা-কর্মীদের জান-মাল উৎসর্গ করা ও হরতাল-অবরোধ, হত্যা-সন্ত্রাস, গাড়ী ভংচুর ইত্যাদি অপকর্মকে নেকীর কাজ মনে করব? এটা তো নিশ্চিত যে, ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নয়। তাহ’লে কোন যুক্তিতে ত্বাগূতের সঙ্গে আপোষ হবে? আমরা কি তাহ’লে দুনিয়ার স্বার্থে আখেরাত হারাব? আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– ‘যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করবে ও আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধারণ করবে এমন এক সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। আমরা মনে করি নবীগণের তরীকাই আমাদের জন্য মুক্তির পথ। এর বাইরের কোন পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইতিমধ্যে যারা উক্ত তরীকা ছেড়ে আপোষের তরীকা বেছে নিয়েছেন কিংবা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরেছেন, তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। যার নযীর আমাদের সামনেই রয়েছে।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ যদি কোন ইসলামী দেশে ইসলামী সংবিধানের অধীনে পার্লামেন্ট ইলেকশনে প্রার্থী হওয়াকে জায়েয বা ওয়াজিব বলেন, সেটাও সঠিক হবে না। কেননা ইসলামী সংবিধানে কেবলমাত্র বিচক্ষণ নির্বাচকদের মাধ্যমেই প্রার্থী বিহীনভাবে একজন বিচক্ষণ ইসলামী গুণাবলী সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তি 'আমীর' নির্বাচিত হ'তে পারেন। অতঃপর সাধারণ জনগণ তাকে সমর্থন করবেন। 'আমীর' যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিজের জন্য সীমিত সংখ্যক একটি মজলিসে শূরা মনোনয়ন দিবেন। যেভাবে দেশের বিচারপতি, যেলা প্রশাসক প্রমুখ ব্যক্তিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। জনগণ তাদের নির্বাচিত করে না।

আজকাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে অনেক সময় মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী পদে দেখা যায়। এগুলি ঈমানদার জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই করা হয়। বরং এরাই ইসলামী দাওয়াতের সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, ইসলামী নেতারাই ইসলামের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেন। তারা অন্য ইসলামী নেতাদের নির্মূল করার চেষ্টাও করেন। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী জনমত শর্ত। তাছাড়া إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ 'আল্লাহ অবশ্যই (অনেক সময়) ফাসেক-ফাজের লোককে দিয়ে এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন'।[৪৬] অতএব আমাদের দায়িত্ব হ'ল সাধ্যমত ইসলামের উপর দৃঢ় ও জামা'আতবদ্ধ থাকা এবং বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। সমাজে একে বিজয়ী করার বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। 'তিনিই রাজাধিরাজ। তিনি যাকে খুশী তাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে থাকেন' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*।

অতএব যদি কেউ সমাজ পরিবর্তনের মহান প্রচেষ্টায় দৃঢ় থেকে নিহত হন বা বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন, তিনি আল্লাহ্র নিকটে শহীদী মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র

---

৪৬. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ হা/৩০৬২, ৪২০২-০৩।

নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[৪৭] তিনি বলেন, مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ'।[৪৮] তিনি আরও বলেন, সত্তুর জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে।[৪৯]

একটি হুঁশিয়ারী (التنبيه) :

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে চরমপন্থী 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ' প্রচলনের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে মিসর ও ভারতের মাটিতে ইসলামের নামে পাল্টা আরেক চরমপন্থী মতবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদটি পুরা ইসলামকেই রাজনীতি গণ্য করে এবং সেই দৃষ্টিতে ইসলামের ইবাদতসমূহকে বিচার করে। এই মতবাদটির পরিষ্কার বক্তব্য হ'ল : 'দ্বীন আসলে হুকুমতের নাম। শরী'আত ঐ হুকুমতের কানূন মাত্র। আর ইবাদত হল ঐ কানূন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'। এই মতবাদ অনুযায়ী 'ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, যিকর-তাসবীহ ইত্যাদি মানুষকে উক্ত 'বড় ইবাদত' তথা হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী অনুশীলনী বা ট্রেনিংকোর্স মাত্র'।[৫০]

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত উক্ত চরমপন্থী দর্শনের অনুসারী দলটি যেনতেন প্রকারেণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাকেই 'বড় ইবাদত' ভাবতে শুরু করেছে এবং ইসলামের ফরয-ওয়াজিব ইবাদতসমূহকে উক্ত বড় ইবাদত হাছিলের তুলনায় 'ছোট-খাট বিষয়' বলে ধারণা করেছে। এই দর্শন দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম রূপে গণ্য করেছে। ফলে এতে দ্বীন ও

---

৪৭. মুসলিম হা/১৯০৯; মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়; আহমাদ হা/২২১৬৯ হাদীছ ছহীহ।

৪৮. মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

৪৯. তিরমিযী হা/১৬৬৩, ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯, মিশকাত হা/৩৮৩৪।

৫০. আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (উর্দূ) ১/৬৯, প্রকাশক : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, দিল্লী-৬, জানুয়ারী ১৯৭৯; দ্রঃ লেখক প্রণীত বই 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' পৃঃ ২৫; এবং 'তিনটি মতবাদ' পৃঃ ২২।

দুনিয়া দু'টিই হারাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে কেবল দুনিয়া পায়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে সে ব্যক্তি দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই পায় *(শূরা ৪২/২০)*। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে ব্যক্তি দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারায় *(হজ্জ ২২/১১)*।

উপরোক্ত দর্শনের অনুসারীরা ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে হেকমতের দোহাই দিয়ে যেকোন সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে থাকেন। যা অনেক সময় সেক্যুলারদের ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এদের ক্ষমতাতন্ত্রী দর্শনের অনুসারী অন্যান্য চরমপন্থী উপদলগুলি তাদের ভাষায় 'সমাজ থেকে ময়লা ছাফ করার' মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং তাদের বিরোধী মতের নেতৃবৃন্দকে হত্যা ও সরকার উৎখাত করাকেই বড় ইবাদত ভেবে নিয়েছে। ফলে ইসলামের নামে তারা এখন ইসলামকেই হত্যা করছে।

অথচ মুমিন জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা *(শূরা ৪২/১৩)*। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করলে সেটা ইবাদত হবে। কেননা রাজনৈতিক শক্তি পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি হ'তে পারে। যদিও অনেক সময় তার বিপরীত হয়ে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক লক্ষ্যে দ্বীন করলে ঐ রাজনীতি প্রতারণা হবে এবং তা গোনাহের কারণ হবে। মোটকথা দ্বীন কায়েমের অর্থ হ'ল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা নয়। আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য হুকুমত কায়েম করা শর্ত নয়, বরং সহায়ক মাত্র।

উপসংহার (الخاتمة) :

পরিশেষে বলব যে, ইসলাম বিরোধী যাবতীয় মতবাদ, যেসবের অনুসরণ মানুষ করে থাকে ও যেসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ তাদের জানমাল ব্যয় করছে, তা সবই 'জাহেলিয়াত' এবং ভ্রষ্টতার উৎস। একইভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জাহেলী তরীকা বেছে নেওয়াটাও চরম ভ্রষ্টতা। নিঃসন্দেহে ইসলামী তরীকাতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, ত্বাগূতী তরীকায় নয়। যিনি ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করবেন ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন, তিনি আল্লাহ্র সাহায্য পাবেন ও আখেরাতে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ।

Contents

এক্ষণে যারা দ্বীনী বিষয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এবং দুনিয়াবী বিষয়ে অন্য কাউকে অনুসরণীয় মনে করেন, তারা প্রকৃত প্রস্তাবে দুই জন রাসূল কামনা করেন। অথচ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত একমাত্র ও সর্বশেষ রাসূল *(সাবা ৩৪/২৮)*। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। তিনিই শেষনবী *(আহযাব ৩৩/৪০)*।[৫১] তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহ্‌র বিধান মেনেছেন এবং সকলকে তা মানতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন *(ইউনুস ১০/১৫)*। অথচ বহু ঈশ্বরবাদীদের মত আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে শর্তহীন আনুগত্য পোষণ করে চলেছি ও তার পিছনে জানমাল উৎসর্গ করছি। এ বিষয়ে কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল-

وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَّخِذُوْا إِلـــهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ–

'আল্লাহ বললেন, তোমরা দুইজন ইলাহ গ্রহণ করো না। নিশ্চয়ই ইলাহ মাত্র একজন। অতএব তোমরা আমাকেই মাত্র ভয় কর' *(নাহল ১৬/৫১)*। তিনি বলেন, مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ 'আল্লাহ কোন মানুষের জন্য তার বুকের মধ্যে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি'... *(আহযাব ৩৩/৪)*। অতএব জীবনের কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং কোন ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য, দু'টি একসঙ্গে চলতে পারে না।

অতএব স্ব স্ব আক্বীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা থেকে জাহেলী মতবাদসমূহের জঞ্জাল ছাফ না করে স্রেফ ছালাত-ছিয়াম কোন মুসলমানকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বীদা সবার আগে প্রয়োজন। সুতরাং একজন সত্যিকারের মুমিন ইসলামকে অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ না ভেবে বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবেই বিশ্বাস করবেন। তিনি ধর্মীয় জীবনে তো বটেই, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা বৈষয়িক জীবনের সর্বত্র ইসলামের দেওয়া মূলনীতি এবং হুদূদ তথা সীমারেখা মেনে

---

৫১. বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/৫২৩, ২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫, ৫৭৪৭, ৫৭৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

চলবেন। আর এভাবেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফরী আক্বীদা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সার্বিক জীবনে ইসলামী বিধান কায়েমে সচেষ্ট হবেন।

অনুরূপভাবে একজন মুমিন অবশ্যই দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রে গুলিয়ে ফেলবেন না। বরং দুনিয়াকে দুনিয়া গণ্য করেই তাকে দ্বীনের রংয়ে রঞ্জিত করবেন। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নবীদের তরীকার বাইরে যাবেন না। দ্বীনের ব্যাপারে কোন 'রায়' ও যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দিবেন না। তিনি আক্বীদা ও বিধানগত ব্যাখ্যায় কখনই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি ও সালাফে ছালেহীনের তরীকা পরিত্যাগ করবেন না। এভাবেই তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবেন ও জান্নাত লাভে ধন্য হবেন ইনশাআল্লাহ।

আহ্বান (دعوتنا) :

হে জান্নাত পিয়াসী ধর্মনিরপেক্ষ মুমিন! আপনি কি বৈষয়িক জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে আল্লাহ্র বিরোধিতা করে পুনরায় আল্লাহ্র রহমত কামনা করেন? আপনি কি দুনিয়াতে ত্বাগূতের উপাসনা করে আখেরাতে জান্নাতের আকাংখা করেন? আপনি কি আপনার জীবনের বৃহদাংশ শয়তানের হাতে সোপর্দ করে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভিক্ষা করবেন? সিদ্ধান্ত আপনিই নিবেন। কেননা আপনার কবরে আপনিই থাকবেন। আপনার আমলনামা আপনারই হবে। আখেরাতে আপনার আমলের হিসাব আপনাকেই দিতে হবে।

মনে রাখবেন জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ দ্বিমুখী ও সুবিধাবাদী লোকদের জন্য নয়। নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, ত্বাগূতের বিরুদ্ধে নিরন্তর জিহাদের মধ্য দিয়েই এ পথে চলতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ তথা ষড়রিপুর হাতছানিকে এড়িয়ে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র নিরংকুশ আনুগত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্র রহমত লাভ করা সম্ভব হতে পারে। অতএব, আসুন পাশ্চাত্যের নব্য জাহেলী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের খপ্পর হ'তে মুক্ত হই এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পুরোপুরিভাবে ইসলামের পথে চলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম- এক নযরে

(العلمانية والإسلام في لمحة)

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি হ'ল নাস্তিক্যবাদের উপরে। ইসলামের ভিত্তি হ'ল তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে।

২. ধর্মনিরপেক্ষদের নিকটে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র। পক্ষান্তরে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম।

৩. তাদের নিকটে মানুষের জ্ঞানই ভাল-মন্দের চূড়ান্ত নির্দেশক। ইসলামের নিকটে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড।

৪. তাদের নিকটে মানুষ নিজেই তার জন্য আইন প্রণেতা। পক্ষান্তরে ইসলামের নিকট আল্লাহ মূল আইনদাতা। মানুষ তার ব্যাখ্যাকারী মাত্র।

৫. রাষ্ট্রনীতিতে তাদের লক্ষ্য হ'ল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। পক্ষান্তরে ইসলামের লক্ষ্য হ'ল ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা।

৬. অর্থনীতিতে তাদের লক্ষ্য হ'ল পুঁজিবাদ। পক্ষান্তরে ইসলামের লক্ষ্য হ'ল অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। তাদের অর্থনীতিতে সূদ-জুয়া-লটারী এক-একটি আবশ্যিক অনুসঙ্গ। ইসলামী অর্থনীতিতে এগুলি চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ।

৭. তাদের নিকটে দুনিয়াই মুখ্য। ইসলামের নিকটে আখেরাতই মুখ্য।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

Contents